যুগে যুগে নারী

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

পরিবেশক—
অনির্ব্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী
ওল্ড ক্যালকাটা রোড
রহড়া, ২৪ পরগণা

প্রথম মুদ্রন :১৯৫৭

মুদ্রক :
সাধন চক্রবর্ত্তী
নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩, ডাঃ কার্ত্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সতী ও দক্ষ

অতীত আজও কথা কয়।

আজও সজাগ হয়ে ওঠে স্মৃতির বাসরে। যুগে যুগে কালে কালে কত কাহিনী, কত ইতিহাস ভারত ভূমির মহিমা অতি যত্নে লালন রক্ষণ করে রেখেছে। কোনো কিছুকেই সে হারিয়ে যেতে দেয়নি। দেয়নি ফুরিয়ে যেতে।

অনেক, অনেক দিনের কথা। এক যজ্ঞের আয়োজন করা হল। দেবতাদের যজ্ঞ। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল হয়ে উঠল আন্দোলিত। তিন ভুবন জুড়ে পড়ে গেল সাড়া। সমস্ত দেবতারা উপস্থিত হলেন যজ্ঞে। মহাসমারোহ। মহাধুমধাম ব্যাপার।

এবারে এসে উপস্থিত হলেন রাজা দক্ষ। অতীব সম্মানিত ব্যক্তি। তাছাড়া দেবতাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর জামাতা। তাই তিনি যজ্ঞস্থলে আসা মাত্রই সব দেবতারা উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন তাঁকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা। চরণ প্রান্তে রাখলেন প্রণাম। প্রণাম করলেন না কেবল পিতা ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু ও যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব।

রাজা দক্ষ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন, এগিয়ে এলেন মহাযোগী মহাদেবের কাছে। আসবেন না কেন? মহাদেব যে দক্ষের জামাতা। দক্ষেরই কনিষ্ঠা কন্যা সতীর বর।

যে সে মেয়ে নয় এই সতী। ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের ছোট মেয়ে। বড় আদরের দুলালী। শৈশব থেকেই তিনি দৃঢ়, সতেজ ও সংযমী। আপন হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা ও সাধন ভজনের গুণে তিনি পতিরূপে লাভ করেছেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। রাজনন্দিনী আজ পাগলিনী বেশে পাগলা ভোলার অনুগামিনী।

শ্মশানে-মশানে দিন কাটে তাঁর। ছাই-ভস্ম মেখে ধ্যানের অতলে ডুবে থাকেন মহাদেব। সতী পরম যত্নে করেন তাঁর সেবা। জগতের কোনো সুখ, কোনো ঐশ্বর্যই তাঁর কাছে শিব-সেবা থেকে বড় নয়। মহৎ নয়।

কনিষ্ঠ জামাতা মহাদেবের কাছে এসেছেন সতীর পিতা দক্ষ। তাঁকে প্রণাম করা, সম্মান দেখানই তো জামাতার কর্তব্য। কিন্তু একি হল? না উঠে দাঁড়ালেন, না নিবেদন করলেন প্রণাম। কেবল চোখ তুলে তাকালেন একবার। তার পরে আবার অতলায়িত হয়ে গেলেন ধ্যানের গভীরে। আত্মরতির সুখ সায়রে।

ভুল করলেন দক্ষ। মহাদেবকে দিলেন তিনি অভদ্র গালাগালি। হলেন ক্ষুব্ধ। নিজেকে মনে করলেন অসম্মানিত।

কিন্তু আশুতোষ বিশ্বভোলা। তিনি অবিচল। স্থির নিস্পন্দ। যেন এক গগণচুম্বী হিমালয় আত্মধ্যানে মগ্ন, মৌন।

জ্বালা জুড়ায় না রাজা দক্ষের। এ অসম্মানের যথাযোগ্য জবাব দিতেই হবে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হলেন তিনি।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

ঐ যজ্ঞের অঙ্গনেই অসম্মানের অবজ্ঞায় শিবকে করতে হবে নগ্ন।

তাইতো দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। আমন্ত্রণ করলেন সকল দেবতাকে। কিন্তু শিবের ঘরে গেল না কোনো আমন্ত্রণলিপি। সতী রইলেন অনিমন্ত্রিত।

কৃতসঙ্কল্প দক্ষ। প্রতিশোধ নিচ্ছেন অপমানের। তাই তো অনুষ্ঠিত করছেন শিবহীন যজ্ঞের।

একে একে সমস্ত দেবতারা এলেন। এলেন এ পুণ্য অনুষ্ঠানে দক্ষের সব মেয়েরা। এলেন না শুধু সতী। কি করে তিনি আসবেন? তিনি যে মহাদেবের পত্নী। অনিমন্ত্রিত।

নারদের 'পর অর্পিত হয়েছিল নিমন্ত্রণের দায়িত্ব। তিনি সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে হাজির হয়েছিলেন গিয়ে কৈলাসে।

কেন?

সতীকে খবরটি জানাতে।

কৈলাসে গিয়ে নারদ সাক্ষাৎ করলেন সতীর সঙ্গে। সতী শুধালেন খবরাখবর। নারদ বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলেন, 'এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তোমার পিতা। সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু তোমাদের নিমন্ত্রণ করবার কোনো আদেশ নেই।'

নারদ চলে গেলেন। সতীর মনে ছায়াপাত হল বেদনার। চিন্তাচ্ছন্না সতী। পড়লেন এক মহা সমস্যায়। পিতা ও স্বামী। মাঝখানে বিভেদের প্রাচীর। কি করবেন সতী কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। পিতা করছেন যজ্ঞ। বিরাট যজ্ঞ। সব বোনেরা গিয়েছেন। আনন্দের বাজার মিলেছে পিতৃকুলে। মনটা হুহু করে চায় ধেয়ে যেতে। কিন্তু স্বামীর আদেশ বৈ কেমন করে তিনি যাবেন? তাঁকে না বলে সতী যে কোনো কাজই করেন না। মনে মনে স্থির করলেন সতী—যে করেই হোক আদেশ তাঁর নিতেই হবে। তা যদি তিনি না করেন তবে যে পিতার অমঙ্গল হবে। কারণ শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব। সর্বনাশ হবে তাঁর পিতার।

ধীর পদপাতে সতী গিয়ে দাঁড়ালেন স্বামীর কাছে। নিবেদন করলেন অন্তরের বাসনা। মঞ্জুর করলেন শিব। খুশী করলেন সতীকে। নন্দী মাকে নিয়ে যাত্রা করলেন দক্ষালয়ে।

সতীর মা পরম খুশী। এতদিন পরে সতী, তাঁর কোলের মেয়ে, এসেছে। সতীর ভাবনাই যে ভাবছিলেন তিনি! মনটাও বিষাদক্লিষ্ট হয়েছিল এতক্ষণ। কিন্তু সতী আসায় সব মেঘ যেন কেটে গেল। প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাসিতে কুশল শুধালেন সতীর। মস্তকে করলেন আশীষ চুম্বন। আনন্দের বান ডাকল দক্ষালয়ে। পরম প্রীত সতী-জননী। সতীকে চোখের দেখা দেখে খুশী বটে, কিন্তু মনে তাঁর তীব্র বেদনা।

এমন মেয়ে, কিন্তু নেই তার কোনো বেশবাস। নিরাভরণা সতী! বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসে ভেঙ্গে যেতে চায় জননীর পাঁজর। অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে দুটি চোখ। মুছে ফেলেন তা একান্ত গোপনে।

কিন্তু অন্যান্য বোনেরা সতীকে দেখেই উঠলেন মুখর হয়ে, 'আহা সতীর মত ভাগ্যহীনা আর কে আছে! পড়েছে এক ভিখারীর হাতে। জীবনের কোন সাধই ওর মিটল না।'

ওরা অন্ধ। ওরা অজ্ঞ। তাই সতীকে দেখল ওরা করুণার চোখে। সতীর মনে কিছু বেদনা নেই। তিনি যে পরম গৌরবে গর্বিত। যিনি বিশ্ব ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, সতী যে তাঁরই স্ত্রী। তাঁরই জীবন সঙ্গিনী। ভোগ বিরতিই তাঁর সাধনা। সর্বত্যাগেই তার আনন্দ।

সতীর অন্য সব বোনেরা হয়েছেন বড় দেবতাদের স্ত্রী। কাজেই বাইরে তাঁদের চোখ ধাঁধান জলুস। বেশভূষার গর্বে তারা গর্বিত। সতীর জন্য তাঁদের যেন কত দুঃখ।

সে যা হোক, এবারে যজ্ঞসভা দেখতে চাইলেন সতী। চললেন সেখানে। রাজা দক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সতীর। পরম সম্ভ্রমে প্রণাম করলেন পিতাকে। দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর সম্মুখে। নির্বাক দুজনেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন রাজা দক্ষ। মহাদেবকে করতে লাগলেন গালাগালি। শুধু কি তাই? সতীকেও ছেড়ে কথা বললেন না দক্ষ। তিরস্কারে জর্জরিত করলেন সতীকে। বিনা নিমন্ত্রণে কেন সে এসেছে যজ্ঞ সভায়! কে তাকে বলেছে আসতে! কোন অধিকারে সে এখানে প্রবেশ করেছে।

নানা ধরণের কটূক্তিতে সতী রইলেন আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর মুখমণ্ডল। কিন্তু তা বলে হারিয়ে ফেললেন না সম্বিত। পিতা যে ক্রোধের তাড়নায় একটা অনর্থের সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই ধীরে শান্ত

কণ্ঠে বললেন সতী, 'আমার স্বামী আপনার তো কোনো অনিষ্ট করেন নি পিতা। বিনা নিমন্ত্রণে আমি এসেছি। আপনি আমাকে তিরস্কার করুন। স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা। আপনি আমার সামনে তাঁর নিন্দা করবেন না পিতা।'

কনিষ্ঠা কন্যার কথা শুনে দক্ষের ক্রোধ বহ্নিমান হয়ে উঠল। সাধারণ ভদ্রতার সীমাটুকু পর্যন্ত বজায় রইল না এবারে। আরো দুর্বাক্য ব্যবহার করতে লাগলেন মহাদেবের উদ্দেশ্যে।

সতী এবারে ধৈর্যচ্যুতা। থর থর করে কাঁপতে লাগল তাঁর সু-কোমল দেহ। কণকদীপ্ত অঙ্গ বরণ ধারণ করল পাণ্ডুর বর্ণ। বিস্ফারিত হতে লাগল নয়ন পল্লব। বক্ষ পঞ্জর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল বারে বারে দীর্ঘশ্বাস।

সাধন সিদ্ধা সতী। এবারে ধারণ করলেন স্বরূপ। স্মরণ করলেন যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের চরণ যুগল। প্রজ্জ্বলিত করলেন যোগাগ্নি। সাক্ষী রইল আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা। সাক্ষী রইল সভাস্থ দেবকুল। সতী সেই যোগাগ্নিতে ত্যাগ করলেন আপন দেহ। জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল চতুর্দিক। দেবতারা করলেন পুষ্প-বর্ষণ।

আর দক্ষ?

তিনি হতবাক। নিথর। নিস্পন্দ। তাঁর অন্তরের গতিছন্দ মন্থর।

নন্দী অপলক নেত্রে সব করলেন প্রত্যক্ষ। অস্থির হয়ে গেলেন মায়ের দেহত্যাগে। উন্মত্ত অধীর নন্দী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন কৈলাসের পানে।

সর্বজ্ঞ ভোলার কাছে কিছুই রইল না গোপন। তিনি পূর্বাহ্নে জানতে পেরেছিলেন সব। নন্দীকে দেখেই 'হা সতি! হা সতি!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সতী শোকে উন্মত্ত ভোলা শুরু করলেন তাণ্ডব নৃত্য। মস্তকের জটা ছিঁড়ে আছড়ে ফেললেন মাটিতে। সমস্ত পৃথিবীটা কেঁপে উঠল থর থর করে। জন্ম নিল সংহার মূর্তি

বীরভদ্র। অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন তিনি যজ্ঞস্থলে। দেবতারা ভীত ত্রস্ত। প্রমাদ গুণলেন তারা। মুহূর্তে যজ্ঞস্থল হল লণ্ডভণ্ড। বীরভদ্র ছিঁড়ে ফেললেন দক্ষের মুণ্ড। আহুতি দিলে যজ্ঞকুণ্ডে। ভয়ে যে যার পালিয়ে বাঁচাল প্রাণ। শিবহীন যজ্ঞ যে আদৌ যজ্ঞই নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল।

এবারে মত্ত ভোলা এসে উপস্থিত হলেন সতীর সান্নিধ্যে। তাঁরই অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি করেছেন দেহত্যাগ। ভূতলে পড়ে রয়েছে তাঁর নিথর দেহ একান্ত অবহেলায়। মহাদেব এসে তুলে নিলেন সতীর শবদেহ স্কন্ধে। ছুটলেন তড়িৎ বেগে। ঘুরতে লাগলেন সেই শ্মশান শিয়রে উদ্‌ভ্রান্তের মত। দিগভ্রান্ত ভোলা। হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলান্তে। সতী ছাড়া দ্বিতীয় ভাবনা নেই কিছু তাঁর। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন তিনি সতীশব স্কন্ধে নিয়ে। ভুলে গেলেন সংহার কর্তা তাঁর সংহার কার্য। চিন্তায় পড়লেন দেবকুল। এখন কি উপায় হবে?

দেবতারা হলেন একত্রিত। গেলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। নিবেদন করলেন আদ্যোপান্ত ঘটনা। নীরবে সব কথা শুনলেন বিষ্ণু। মনে মনে ঠিক করলেন এক মতলব।

কি মতলব?

সতীর শবটি মহাদেবের কাঁধ থেকে সরিয়ে না আনতে পারলে আর উপায় নেই।

কিন্তু তা কি ভাবে সম্ভব?

অলক্ষ্যে চালাতে হবে সুদর্শন চক্র। খণ্ড খণ্ড করে দিতে হবে সতী দেহ।

তবে তাই হোক। তাই হোল। ৫১ খণ্ডে খণ্ডিত হল সতী দেহ। ভারতবর্ষের ৫১ স্থানে পড়ল গিয়ে সতীর পূণ্য দেহের অংশগুলো। সেই থেকে আজ অবধি পূণ্যার্থীদের অবিচ্ছিন্ন মিছিল চলেছে, মিছিল চলেছে এই ৫১টি মহাপীঠস্থানে।

দেবী দেহ তো খণ্ডিত হল, কিন্তু মহাদেব কি করলেন? এক সময় তিনি বুঝতে পারলেন, দেবীদেহ নেই তাঁর স্কন্ধে। অধীর হয়ে পড়লেন মহাদেব। আকুল আর্তি গুমড়ে উঠল তাঁর অন্তরে। মন্থর হল চলার গতি। নেমে এল বৈরাগ্য। স্থির শান্ত শিব তনু। আর যেন পথ চলতে মন চায় না। চলে এলেন হিমালয়ের এক নিভৃত নিকেতনে। মহাতাপস মহাধ্যানে হলেন মগ্ন।

কিন্তু কার ধ্যান করবেন তিনি? কি ধ্যান করবেন? তাঁর যে সিদ্ধি করায়ত্ব। সর্বসিদ্ধিদ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত। সাধন জগতের সকল দুয়ার তাঁর জন্য খোলা। কেন? শক্তি ছাড়া শিব যে শব। তাই সতী সাধনায়ই আত্মমগ্ন হলেন মহাযোগী। সতী যে তাঁর শক্তি। ওঁকে তাঁর চাই-ই চাই।

*　　*　　*　　*

পর্বতরাজ হিমালয়। পাশে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী। নাম মেনকা। মেনকার অনেক সন্তান। মৈনাক তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

বহু সন্তানের জননী হয়েও সাধ মেটেনি। তাঁর অন্তরে আর একটি বাসনা ঘুমিয়ে ছিল।

কি সে বাসনাটি?

রাজ দম্পতি অতি সঙ্গোপনে করছিলেন একটি তপস্যা।

কিসের?

ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ করবার জন্য।

এ সুপ্ত বাসনাটি আজ যেন তাঁর দিন রাত্রির সমস্ত সময়কেই জুড়ে বসে আছে। সাধনা সঠিক হলে সিদ্ধিলাভ তো সহজ সাধ্য কাজ। মেনকার মনোবাসনা পূর্ণ হল। তাঁর গর্ভে এসে জন্ম নিলেন সতী। ভূমিষ্ঠ হলেন শুভ দিনে। দেবতারা করলেন পুষ্পবৃষ্টি। মেনকার তৃপ্তির সীমা নেই। অপূর্ব, অদ্ভুত মেয়ে। এ যেন বিশ্বসৌন্দর্যের

ঘনীভূত মূর্তি। মনোহরণ রূপ। দর্শন লোভন কান্তি। যিনি দেখেন তিনিই আদর করেন। কাছে টানেন। চান কোলে তুলে নিতে। কত সোহাগ মেয়ের। কত নাম তাঁর। পার্বতী, গৌরী, উমা। নানা জন নানা নামে ডাকেন তাঁকে।

ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ওঠেন। অতিক্রান্ত হয় তার শিশুকাল। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলেন পুতুল খেলা। মাটি দিয়ে গড়ান শিব। তাঁকে করেন খেলার সঙ্গী। কখনো ঐ মাটির শিবকেই বসান পূজার আসনে। ভক্তি ভরে দেন তাঁর চরণে প্রাণের অর্ঘ্য। নয়ন মুদে আসে তখন। শিব শিরে প্রসূন-অর্ঘ্য দিতে দিতে নিজেকে যান বিস্মৃত হয়ে।

কৈশোরের পাদপীঠ থেকে পার্বতী এসে দাঁড়ালেন যৌবনের বিলোল বিজনে। মনের নেপথ্যে এসে ছায়ার মত সঞ্চারিত হল গত জন্মের কাহিনী। পার্বতী দর্শন করলেন তাঁর সতী-জীবনের বেদনাময় অধ্যায়। এবারে আরো মন্থর হয়ে উঠলেন। শিবই যে তাঁর ইহকাল পরকালের সঙ্গী, সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা রইল না। খেলার ছলে একদিন যে শিব পূজো নিয়ে তিনি মেতে থাকতেন, সেই শিবই যে এখন হয়ে উঠল তাঁর কুমারী জীবনের পরিণতির স্বপ্ন।

পিতা হিমালয় বুঝতে পারলেন কন্যার মনের বাসনা। তিনি শিবকেই মনে করলেন পার্বতীর যোগ্যপাত্র। কিন্তু কি করে এ প্রস্তাব রাখবেন তাঁর কাছে। যদি তিনি এ কাজে সম্মত না হন।

নারদ এলেন একদিন। বলে গেলেন মহাদেবের সঙ্গেই বিয়ে হবে পার্বতীর। হিমালয়ের দ্বিধা ভঙ্গ হল। আশ্বস্ত হলেন তিনি। ওদিকে সখীদের সঙ্গে পার্বতী তখন শিব ধ্যানে তন্ময়। মাঝে মাঝেই যান মহাদেবের কাছে। করেন তাঁকে পূজা। ব্যাপারটা ভাল লাগত না মেনকার। তিনি প্রথম প্রথম বারণ করতেন পার্বতীকে। কিন্তু নারদ আসার পর থেকে তিনিও কিছু বলেন না এখন। হিমালয় আর মেনকা এবারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাঠিয়ে দিতেন পার্বতীকে

শিবপূজা করতে। মাটির পুতুল আর নেই। এখন পার্বতী স্বয়ং শিবের পূজারিনী।

ওদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে দেবকুল অস্থির। মহা বিপাকে পড়লেন দেবতারা। যে যার অধিকার থেকে হতে লাগলেন বঞ্চিত। নানা ধরণের লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলেন তারা।

এখন উপায় ? এ অত্যাচার থেকে বাঁচার পথ কি ?

দেবতারা দল বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মার কাছে। বললেন সব বঞ্চনা আর দুঃখের ইতিহাস। সব কথা শ্রবণান্তে বললেন ব্রহ্মা, 'এ মহা বিপদ থেকে একমাত্র শিব পুত্রই পারেন তোমাদের রক্ষা করতে। পারেন তিনি তারকাসুরের বিনাশ সাধন করতে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে। শিব যে এখন ধ্যান নিমগ্ন। গিরিরাজকন্যা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হলে তবেই এর প্রতিকার সম্ভব।'

অনেক চিন্তা অনেক ভাবনার পরে দেবতাগণ মদনাকে পাঠালেন হিমালয়ে। মদন যদি পারেন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে !

মদন এলেন। সুযোগের অপেক্ষায় ক্ষণ গুণতে লাগলেন। শিবের ধ্যান ভাঙ্গতে হবে। সে কি সহজ কাজ !

এলো সে পরম মুহূর্ত। পার্বতী এসেছেন শিব পূজা করতে। মদনও হয়েছেন উপস্থিত। এই তো সময়। বাইরে ঝির ঝিরে হাওয়া বইছিল। তরু বিথারের সাথে সাথে পুষ্পের সমারোহ। প্রকৃতির বুকে হয়েছে বসন্তের সমাগম। নতুন শ্রীতে রূপস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। পার্বতী পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন মহাদেবের চরণ প্রান্তে। করপল্লবে তুলে দিচ্ছেন পদ্মবীজের মালা। ভক্তের অন্তরের অঞ্জলি গ্রহণ করছেন পরম যত্নে মহাদেব। এই তো প্রকৃষ্ট সময়। সুযোগ বুঝে মদন সম্মোহন শর যোজনা করলেন পুষ্পধনুতে। ক্ষণিকের জন্য চাঞ্চল্য এলো মহাদেবের মনে। বিলোল কটাক্ষে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন পার্বতীকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দমন করে ফেললেন সে চাঞ্চল্য। কিন্তু

কেন এমন হোল। একথা ভাবতেই মহাদেব তাঁর সম্মুখে দেখলেন মদনকে। মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন মদন মহাদেবের তৃতীয় নয়নের আগুনে। হাহাকার করে উঠলেন দেবতারা। মহাদেব চলে গেলেন অন্যত্র। আশাহত পার্বতী। ঘরে ফিরলেন ক্ষুণ্ণ মনে। শুরু হল পার্বতীর জীবনে কৃচ্ছ্র সাধনা। তিনি একথা অন্তর মন দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে শুদ্ধ প্রেম বাইরের সৌন্দর্যকে ভেদ করে হৃদয়ের স্পর্শে মহিমময় হয়ে ওঠে। রূপে প্রকৃত প্রেমলাভ হয় না। চাই সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যা।

পার্বতী তপে বসলেন। কৃচ্ছ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন তাপসী। কিন্তু এ বড় কঠোর ব্রত। দেহ-সুখ নয়—দেহ দাহের মধ্য দিয়ে যেতে হবে পরা প্রেমের সুধা—সমুদ্রে।

তাই তো পার্বতী পরিত্যাগ করলেন বসনভূষণ। ধারণ করলেন বল্কল ও চীরবাস। অনাহারে দিন কাটতে লাগল তাঁর। নিদ্রা-হীন আঁখি। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসে যোগিনী যজ্ঞে দিতে লাগলেন অন্তরের আহুতি। মুখে নিরবধি বলতে লাগলেন শিবনাম।

কন্যার এ অবস্থা দেখে হিমালয় পড়লেন মহা ভাবনায়। অস্থির হয়ে পড়লেন শিব। ভক্তের ডাকে কেমন করে ঠিক থাকবেন তিনি। বিচলিত হল তাঁর অন্তর। ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালেন পার্বতীর সামনে। বলতে লাগলেন শিব পার্বতীকে—তুমি শিবধ্যানে তন্ময়। তিনিই তোমার অভীষ্ট দেবতা। কিন্তু তাঁর দিন কাটে শ্মশানে—মশানে। ভস্ম মেখে বসে থাকেন তিনি। ভোলানাথ সব ভুলে নাম ধরেছেন বিশ্বভোলা। তাকে বিয়ে করলে যে তোমার অশেষ দুঃখ হবে। তার চেয়ে তুমি অন্য দেবতার পাণি গ্রহণ কর। পরম সুখী হতে পারবে জীবনে। দেবতাদের মধ্যে শিবই নিকৃষ্ট। তুমি এই নিকৃষ্ট দেবতার ধ্যান করছ? নানাভাবে পার্বতীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন ছদ্মবেশী

শিব। কিন্তু পার্বতী শিব নিন্দা শ্রবণে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ঘটল তাঁর ধৈর্যচ্যুতি। তিনি উদ্যত হলেন শাপ দেবার জন্য। মুহূর্তে ছদ্মবেশের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল শিবতনু। পরম প্রীত হলেন পার্বতী। সিদ্ধ হলেন তপস্যায়। লাভ করলেন পার্বতী তাঁর অভীষ্ট দেবতাকে। শিব সম্মত হলেন পার্বতীকে বিয়ে করবার জন্য।

পার্বতীর মা মেনকা ও পিতা হিমালয় আজ পরম খুশী। আমন্ত্রণ করলেন সকল দেবতাদের। বিবাহ আসরে উপস্থিত হলেন সকলে। হিমালয় নিজেই কন্যা সম্প্রদান করলেন শিবের হাতে। সতী শোকে উন্মাদ ভোলানাথ লাভ করলেন তার হারান সতীকে। দেবতাদের অনুরোধে জীবন দান করলেন মদনকে। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে। সাধন সিদ্ধ সতী তাঁর সতীত্বের গুণে পার্বতী নামে অবতীর্ণা হলেন ধরায়। লাভ করলেন তাঁর আজন্মের অধিদেবতা শিবকে।

॥ সাবিত্রী ও সত্যবান ॥

পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়াল খাঁ-র দেশে এক শ্রেণীর ফকীর ছিলেন। তাদের বলা হত গাজীর পীর। চৈত্র-বৈশাখের খর তাপে তাঁরা পূর্ববঙ্গের অধুনা বাঙলা দেশের গ্রামে গঞ্জে করতেন বিচরণ। যেতেন গৃহস্থদের আঙ্গিনায়। বলতেন ছড়া। মাগতেন ভিখ্। বলতেন, 'মা ঠান, গাজীর বিদায় দ্যান।' মনে পড়ে, আজও মনে পড়ে সেই গেঁয়ো চাষীর কণ্ঠে উচ্চারিত ছড়া গানের কলি—

'সতীনারীর পতি যেন পর্বতেরই চূড়া
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুড়া।'

এ তত্ত্ব কথা যে কত সত্যি, কত অভ্রান্ত আজ আমাদের পুনা-কালের এক কাহিনীর মাধ্যমে সেই কথাই বলছি।

যাকে আমরা মাদ্রাজ বলি তার পূর্ব নাম ছিল মদ্র। এই মদ্র দেশে ছিলেন এক রাজা। নাম তাঁর অশ্বপতি। অশ্বপতির মনে বড় বেদনা। এত সব ঐশ্বর্য তাঁর কে ভোগ করবে? কে করবে এই বিশাল সম্পত্তির দেখা শোনা!

কেন?

তিনি যে নিঃসন্তান।

নিরাশার বালু বেলায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে পড়েন হতাশায়। দীর্ঘশ্বাসে পঞ্জর চুপসে যেতে চায়। নিভে যায় মনের রোশনাঈ। বড় একা লাগে। মনে হয় বড় অসহায়। শূণ্য আর শূণ্য। শুধু আদিগন্তে শূণ্যের সমারোহ।

এ অব্যক্ত বেদনার নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

ধর্মাত্মা অশ্বরাজ দিবস শর্বরী শুধু ভাবেন আর ভাবেন। অবশেষে এলেন একটি সিদ্ধান্তে। সন্তান কামনায় তিনি করবেন সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে লক্ষহোম। আয়োজন করা হল যজ্ঞের। দীর্ঘ আঠার বৎসর পূর্ণ হল। তুষ্ট হলেন সাবিত্রী। হোম কুণ্ড থেকে উঠে এলেন তিনি। দাঁড়ালেন রাজার সম্মুখে। চাইলেন বর দান করতে। রাজা অশ্বপতি বললেন, 'দেবী, আমাকে বহু পুত্র বর দান করুন।'

দেবী বললেন, 'তোমার মনোবাসনার কথা পূর্বাহ্ণেই আমি জানিয়ে ছিলাম ব্রহ্মাকে। তাঁর আশীর্বাদে তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা লাভ হবে। তুমি প্রত্যুক্তি ক'রোনা অশ্বরাজ!'

প্রসন্ন চিত্তে অশ্বপতি গ্রহণ করলেন সাবিত্রীর বর। যথা-সময়ে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে এলো সন্তান। ভূমিষ্ঠা হল দশমাস দশদিন পরে সেই লোচন লোভনা কন্যা। দেবতার আশীর্বাদে যার জন্ম, তার রূপের আর তুলনা কি? রাজা নবজাতিকার নাম দেবীর নামানুসারে রাখলেন সাবিত্রী।

সাবিত্রীর আচার, আচরণ, রূপ ও গুণ দেবী সুলভ হয়ে উঠল। শৈশব অতিক্রম করে পদার্পণ করলেন যৌবনে। হলেন বিয়ের যোগ্যা। পিতা সন্ধান করতে লাগলেন বরের। কিন্তু সাবিত্রীর তেজের জন্য কেউ সাহস পেলেন না তাঁর পাণি গ্রহণ করতে। মহাবিপাকে পড়লেন রাজা অশ্বপতি। কোথায় পাবেন তিনি সাবিত্রীর উপযুক্ত বর। অবশেষে রাজা বললেন একদিন কন্যাকে, 'পুত্রি, তুমি নিজেই অন্বেষণ কর তোমার উপযুক্ত গুণবান পতির।'

লজ্জাবনতা সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণ করে আনত মস্তকে প্রণাম করলেন তাঁকে। তার পরে বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গে রথে উঠে যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন রাজর্ষিগণের তপোবন দর্শনে। তীর্থ থেকে তীর্থে গেলেন সাবিত্রী। ধনদান করলেন ব্রাহ্মণদের।

বহুদেশে ভ্রমন করলেন সাবিত্রী। অবশেষে উপস্থিত হলেন গিয়ে আর এক তপোবনে। এখানে এসে সাক্ষাৎ হল সত্যবানের সঙ্গে। তাঁকে দর্শন মাত্রেই সাবিত্রী তাঁকে মনে মনে পতি রূপে বরণ করলেন।

কে এই সত্যবান?

শাল্ব নামে ছিল এক দেশ। তার রাজা ছিলেন দ্যুমৎ সেন। বৃদ্ধ রাজা। জরাগ্রস্থ। ক্রমে হারিয়ে গেল তার দৃষ্টি শক্তি। এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করল তাঁর শত্রুগণ। করল তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত। অসহায় দ্যুমৎ সেন পত্নী সুবর্ণা ও পুত্র সত্যবানকে নিয়ে এসে উপনীত হলেন তপোবনে। এবং ওখানেই বাঁধলেন তাঁর দুঃখের কুঁড়ে ঘর। সাবিত্রী সত্যবানে এখানেই হয়েছিল দেখা। হয়েছিল চার চোখের মিলন।

সে দিন অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে বলছিলেন কথাবার্তা। সাবিত্রী এসে উপনীত হলেন সেখানে। প্রণাম করে দাঁড়ালেন পিতার সম্মুখে। কুশল শুধালেন অশ্বপতি। কন্যা বললেন, 'তপোবনবাসী সত্যবানকে মনে মনে আমি পতিরূপে বরণ করেছি।'

নারদ শিউড়ে উঠলেন, 'সত্যবানের পিতা মাতা সদা সত্য বাক্য ব্যবহার করেন বলে ব্রাহ্মণরা তাঁদের পুত্রের নাম রেখেছেন সত্যবান। বাল্যকালে অশ্বকে ভালবাসত সে। তাই মাটি দিয়ে গড়ত অশ্ব। আঁকত অশ্বের চিত্র। তাই সত্যবানের আর এক নাম চিত্রাশ্ব। দানে সে রন্তিদেবের ন্যায় দাতা। শিবির মত সে ব্রাহ্মণসেবী ও সত্যবাদী। চন্দ্রের মত সে প্রিয়দর্শন। সবই তাঁর ভাল। কিন্তু একটি দোষ বিদ্যমান—সত্যবান অল্পায়ু। এক বৎসর পরে তার মৃত্যু হবে।'

অশ্বপতির বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। আতঙ্কে কণ্ঠ শুকিয়ে গেল তাঁর। স্নেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে কন্যার পানে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'সাবিত্রী, যাও মাগো, তুমি আবার যাও। অন্য কাকেও বরণ কর স্বামীত্বে।'

কিন্তু সাবিত্রী অটল। তিনি পিতার পানে তাকিয়ে বললেন, 'আমি মনে মনে সত্যবানকেই বরণ করেছি স্বামী রূপে। আবার আমি কি ক'রে অপরকে বিয়ে করব? অল্পায়ু হলেও সত্যবানই আমার স্বামী।'

অনন্যোপায় হয়ে দেবর্ষি নারদ আশীর্বাদ করে গেলেন সাবিত্রীকে। অশ্বপতি গমন করলেন, গমন করলেন পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে দ্যুমৎসেনের তপোবনে।

উভয়ের মধ্যে হ'লো আলাপন। অশ্বপতি বললেন দ্যুমৎসেনকে, 'রাজর্ষি, আমার সুন্দরী কন্যাকে আপনি আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।'

দ্যুমৎসেন বিনম্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি রাজ্যচ্যুত আশ্রয় নিয়েছি এসে অরণ্য-স্নেহে কি করে আপনার কন্যা এ কষ্ট সহ্য করবেন?'

অশ্বপতি বললেন, 'সুখ বা দুঃখ দুই অস্থায়ী আমিও আমার কন্যা তা সম্যক জ্ঞাত। বড় আশা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না আপনি'

অবশেষে দ্যুমৎসেন সম্মত হলেন অশ্বপতির প্রস্তাবে।

বিয়ে হয়ে গেল সাবিত্রীর সঙ্গে সত্যবানের। সাক্ষ্য রইলেন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ। আর আদিগন্তের সবুজ বিথার। কন্যাকে উপযুক্ত বসন ভূষণে ভূষিত করলেন অশ্বপতি। দান করলেন পরম আগ্রহে। প্রস্থান করলেন আনন্দিত চিত্তে।

সাবিত্রী খুলে ফেললেন তাঁর আভরণ ধারণ করলেন বল্কল ও গৈরিক বাস। শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীর সেবায় করলেন আত্মনিয়োগ। তাঁরা তুষ্ট হলেন সাবিত্রীর সেবায়।

সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে সাবিত্রীর মনের নেপথ্যে উঁকি দিয়ে যায় দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যৎ বাণী। দিন কাটে। অতিক্রান্ত হয় মাসের পর মাস। সাবিত্রী তাঁর বিয়ের দিন থেকে

গনণা করে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর মাত্র চারদিন। তার পরেই মৃত্যু হবে তাঁর স্বামীর।

অচঞ্চলা সাবিত্রী। ধৈর্যের বাঁধন এটে, সতীত্বের নিষ্ঠায় স্বামীর প্রাণ রক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন করলেন। সংকল্প করলেন তিনি ত্রিরাত্রি উপবাসের। দ্যুমৎ সেন বললেন, 'রাজকন্যা, এ যে বড় কঠোর ব্রত। কি করে তুমি ত্রিরাত্রি থাকবে অনাহারে?'

সাবিত্রী বললেন, 'ভাববেন না আপনি। নিশ্চিতই আমি পারব ব্রত উদযাপন করতে।'

ব্রত উদযাপন করলেন সাবিত্রী। গুরুজনদের প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলেন করজোড়ে। তপোবনবাসীরা এগিয়ে এলেন। সাবিত্রীকে করলেন আশীর্বাদ, 'এয়োত্রী হও।'

শ্বশুর শাশুড়ী বললেন, 'ব্রত সমাপ্ত হয়েছে তোমার। এবারে আহার্য গ্রহণ কর।'

সাবিত্রী বললেন, 'সংকল্প করেছি, সূর্য অস্ত গেলে আহার করব।'

সত্য চেতনা, সত্য ভাবনা, সত্য যার সঙ্গী, তাঁর কাছে সুখ দুঃখ দুই সমান। সাবিত্রীর নিষ্ঠার অন্ত নেই। তিনি সতীত্বের দৃঢ় বেদীতে দেবীর আসনে সমারূঢ়া। স্বামীকে ছেড়ে তিনি কোথাও থাকবেন না।

সত্যবান কুঠার কাঁধে চলেছেন বনে। সাবিত্রী বললেন 'আমিও যাবো।'

সত্যবান নানা ভাবে চাইলেন তাঁকে বিরত করতে। অরণ্য-সঙ্কুল পথ। কন্টকময়। পথে ভয় আছে। ভীতি আছে। এ কষ্ট একজন নারীর বেলায় দুঃসহ।

সে কথায় কান দেন না সাবিত্রী। স্বামীর পেছন পেছন চললেন গহন ঘন অরণ্য গভীরে।

সত্যবানের আজই শেষ দিন। আজই বরণ করতে হবে তাঁকে মৃত্যু।

বৃক্ষ থেকে ফল পাড়লেন সত্যবান। ভর্তি করলেন পাত্র।

তারপরে লাগলেন কাঠ কাটতে। ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সত্যবান। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে লাগল। স্বেদসিক্ত হয়ে গেল সারা অঙ্গ। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। স্বামীর মস্তকটি অঙ্কে ধারণ করলেন সাবিত্রী। বসে পড়লেন মরকৎ শয্যায়।

ক্ষণ বিরতি। রক্তবসনধারী সূর্যদীপ্ত এক বিশাল পুরুষ আবির্ভূত হলেন সেখানে। চূড়াবদ্ধ কেশ। আরক্ত আঁখি। কালো রাত্রির মত গায়ের বরণ। ভয়ঙ্কর এ পুরুষ মূর্তি। হস্তে পাশ।

দর্শন মাত্র সাবিত্রী স্বামীর মাথাটি কোল থেকে নামিয়ে বললেন, 'হে দেব, আপনাকে প্রণাম। আপনি কে? কি চাই আপনার বলুন!'

বললেন যম, 'তুমি পতিব্রতা, তপোসিদ্ধা। তাই তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে তার বিদায়ের পালা। আমি যম। এসেছি তাকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যেতে। সত্যবান ধর্মপ্রাণ, গুণবাণ। তাই আমার চর না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি তাকে নিয়ে যেতে।'

সাবিত্রী নির্বাক। যম সত্যবানের দেহ থেকে নিয়ে নিলেন অঙ্গুষ্ঠ পরিমান পুরুষ (১) করলেন তাকে পাশবদ্ধ। প্রাণহীন দেহটি রইল পড়ে। নিষ্প্রভ। নিশ্চল। শ্বাসহীন।

যম চললেন দাক্ষিণ দিকে। সাবিত্রী করলেন তাঁর অনুসরণ। যম বললেন, 'তুমি ফিরে যাও সাবিত্রী। কর গিয়ে স্বামীর পারলৌকিক কাজ কর্ম।'

সাবিত্রী বললেন, 'স্বামীকে অনুসরণ করাই স্ত্রীর সনাতন ধর্ম। সুতরাং, আপনি আমাকে বারণ করছেন কেন?'

যম বললেন, 'তোমার ধর্মজ্ঞানে আমি পরম প্রীত। স্বামীর জীবন বৈ অন্য যে কোন বর তুমি প্রার্থনা কর।'

(১) সূক্ষ্ম অথবা লিঙ্গ শরীর।

সাবিত্রী বর চাইলেন, 'আমার শ্বশুর দৃষ্টিহীন, অন্ধ। তাকে দৃষ্টি দান করুন।'

যম বললেন, 'তথাস্তু।'

শুরু হল যমরাজের পথচলা। কিছু দূর গিয়ে তাকালেন পেছন ফিরে। দেখলেন, সাবিত্রী বায়ু বেগে ছুটে আসছেন পিছু পিছু। যম বললেন, 'সাবিত্রী তোমার পতির আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘরে ফিরে যাও তুমি। তোমার 'পর আমি অধিক সন্তুষ্ট হয়েছি। পতির জীবন ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা কর।'

সাবিত্রী বললেন, 'আমার শ্বশুর যাতে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে পারেন, এমন বর প্রদান করুন।'

যম বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

পর পর দুটো বর আদায় করেও, বিরত হলেন না সাবিত্রী। আবার চললেন যমরাজের পেছন পেছন। যম বললেন, 'পুনরায় কেন আগমন করছ? যাও, ঘরে ফিরে যাও।'

সাবিত্রী বললেন, 'আমি যে গৃহে ফিরতে অসমর্থ। কোন এক অদৃশ্য শক্তি, যেন আমাকে প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে স্বামীর বসতি, সেখানেই হবে স্ত্রীর উপস্থিতি। আমার আত্মা বহু পূর্বেই গমন করেছে। এখন শুধু যাচ্ছে আমার দেহটি।'

যম বললেন, 'আর কি বর তোমার প্রার্থনীয়?'

সাবিত্রী বললেন, 'আমার পিতার পুত্র সন্তান হোক।'

যম মঞ্জুর করলেন সাবিত্রীর প্রার্থনা। কিন্তু এখনো তো চাওয়া হয়নি শেষ বরটি। তাই ফিরে আসতে পারছেন না সতী সাবিত্রী। চলেছেন শুধু চলেছেন। এ চলার যেন বিরাম নেই। যম বললেন, 'আর অগ্রসর হ'য়ো না। গৃহে গমন কর।'

সাবিত্রী বললেন, 'আপনি সজ্জন। সজ্জনের সান্নিধ্যও প্রীতিপ্রদ। সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন সাধু জন। তাঁরা দান করেন।

অনুতপ্ত হন না। তাঁদের অনুগ্রহে অসীম শক্তি। কখনো তা ব্যর্থ হয় না। তাঁদের কাছ থেকে কেউ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন না। কারণ তাঁরা সকলেরই পালক ও রক্ষক।' সাবিত্রীর কথা শ্রবণ করে যমরাজ তন্ময় হয়ে পড়লেন।

যম বললেন তোমার ধর্মমত অদ্ভুত। তোমার বাক্য সুমধুর। তোমার প্রতি হৃদয়ে আমার ভক্তির উদ্রেক হয়েছে। হে পতিব্রতা, বল আর কি বর তুমি চাও?'

মুহূর্তে সাবিত্রী যাচ্ঞা করলেন, 'পিতঃ, অশেষ আপনার কৃপা। অনেক বর দয়া করে দান করেছেন আপনি। এবারে এই বর দিন, সত্যবানের পুত্র যেন রাজা হয়।'

যমরাজ আবেগ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তথাস্তু।'

আশ্বস্ত হলেন সাবিত্রী। কিন্তু পেছন ছাড়লেন না তবুও। যম বললেন, 'সকল বরই তো তোমাকে দিলাম। তোমার স্বামীর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কিছু দেবার মত নেই। এখন তুমি গৃহে ফিরে যাও।'

সাবিত্রী বিস্ময়াবিষ্টের মত যমরাজের দিকে আয়ত করুণ আঁখি-পাতে বললেন, 'হে ধর্মরাজ, এই মাত্র বললেন সত্যবানের পুত্র রাজা হবে। কিন্তু সত্যবান যে মৃত। কি করে তা সম্ভব বলে মানব? আপনার বাক্য কি তবে মিথ্যা হয়ে যাবে?'

চিন্তাচ্ছন্ন যমরাজ। যুক্তিতে, তর্কে, সংকল্পে ও তপস্যায় সাবিত্রী সিদ্ধা। যমরাজ আপন পাশে আপনি এবারে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। অবশেষে বাধ্য হয়েই সত্যবানের জীবন দান করতে হল। ধর্মরাজ হলেন পরাভূত সাবিত্রীর কাছে।

এ যেন নিদ্রা ভঙ্গের পরে সদ্য জাগরণ। কিছুই জানলেন না সত্যবান। এতক্ষণ যেন তিনি ছিলেন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। পার্শ্বে সাবিত্রী তখনো নিদ্রাচ্ছন্না। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন সত্যবান। অভিমানের অভিব্যক্তি ঘটল মৃদু অনুযোগে। ঘুম ভাঙ্গল সাবিত্রীর।

উঠে বসলেন। তিনি ক্লান্ত। শ্রান্ত। অবশ তনু। স্বামীর জীবন যমরাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য করেছেন তিনি প্রবল সংগ্রাম। সে খবর কে জানে? কেউ না। না দ্যুমৎ সেন। না অশ্বপতি। এমন কি সত্যবানও নয়। ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বললেন সাবিত্রী। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলেন সত্যবান। ধন্য হলেন তিনি।

অনুশোচনার আগুনে পুড়ে গেল সত্যবানের মনের অনুযোগ। পিতা মাতাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। তাঁরাও অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছেন। কতদিন হয়ে গেল পুত্র দর্শন করেননা দ্যুমৎ সেন। অবশেষে সাবিত্রী সত্যবান চললেন তপোবনে। দ্যুমৎ সেন ফিরে পেলেন তাঁর হৃতরাজ্য। ফিরে পেলেন তাঁর অন্ধ চোখে দৃষ্টি। দ্যুমৎ সেনকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য তপোবনে উপস্থিত হয়েছে এসে চতুরঙ্গ সৈন্য। হৃষ্টচিত্তে তিনি তাঁর মহিষী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে গেলেন রাজ্যে। সত্যবানকে করলেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। দুঃখের দরিয়ায় ডাকল আনন্দের বান। সুখ শান্তিতে সত্যবান করতে লাগলেন রাজ্য পরিচালনা। শতপুত্র লাভ করলেন সাবিত্রী। চতুর্দিকে প্রচারিত হল সাবিত্রীর মহিমা।

কত যুগ যুগান্ত হয়েছে অতিক্রান্ত। মন্দাক্রান্তা হয়েছে জীবনের ছন্দ। অন্ধ প্রগতির দাপটে মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এসেছে আদর্শ, সত্য ও ধর্মকে বিস্মৃত হবার দুরন্ত তাগিদ। তবু আজও ভারতীয় নারীদের অন্তরাকাশে সাবিত্রী উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের মত প্রজ্জ্বলন্ত. প্রভাময়ী হয়ে পথ দেখাচ্ছেন।

অনসূয়া

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একদা এসে উপস্থিত হলেন মহর্ষি অত্রির আশ্রমে। এলেন ব্রাহ্মণ বেশে। শূন্য আশ্রম। মহর্ষি নেই। গিয়েছেন তিনি কার্যব্যাপদেশে অন্যত্র। এখন উপায়? কে গ্রহণ করবে অতিথি-সৎকারের দায়িত্ব। অবশেষে বাধ্য হয়েই অনসূয়াকে গ্রহণ করতে হল সে-ভার।

পতিপ্রাণা সতী। তিনি কি ফিরিয়ে দিতে পারেন ব্রাহ্মণদের অভুক্ত? তাতে যে স্বামীরই অমঙ্গল হবে। হবে মহর্ষি অত্রির আশ্রমের দুর্নাম। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির সহধর্মিনী তাই নিজ হাতে অতিথিদের সেবা যত্নে করলেন আত্মনিয়োগ। প্রদান করলেন পাদ্যার্ঘ্য। প্রস্তুত করলেন ক্ষুধার্ত অতিথিগণের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন। আহ্বান করলেন তাঁদের। বিনয়াবনত হয়ে করজোড়ে বললেন—আসন গ্রহণ করুন।

আসন গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মণগণ। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা আছে অতিথিদের। কি সে প্রতিজ্ঞা?

বললেন ব্রাহ্মণগণ—'বস্ত্র আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত কেউ পরিবেশন করলে, সে অন্ন আমরা গ্রহণ করতে পারব না।'

তার মানে? নগ্না হয়ে, নিরাভরণা হয়ে পরিবেশন করতে হবে অন্ন ব্যঞ্জন। তবেই গ্রহণযোগ্য হবে তা অতিথিদের। ক্ষুধার্ত অতিথিরা বসে আছেন। মহা সমস্যায় পড়লেন অনসূয়া। স্বামী নেই আশ্রমে। কখন তিনি আসবেন তারও নেই কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়। অথচ ভোজনের আসনে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ নিশ্চল নীরব। কি উপায় হবে? প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাছে

কি করে নগ্না হয়ে পরিবেশন করবেন অনসূয়া। ওদিকে অভুক্ত অতিথিবৃন্দ আসন ছেড়ে উঠে গেলে যে, আশ্রম ধর্মেরই হানি হবে। অথচ তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হলে, সতীধর্মের পতন অনিবার্য।

উভয় সঙ্কটে পড়ে অনসূয়া স্মরণ করলেন, সঙ্কটহারী শ্রীমধুসূদনকে। মন্ত্রপূত করলেন পুণ্যবারি। ছিটিয়ে দিলেন তা অতিথিদের মস্তকে। সতীত্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠল তাঁর শক্তি-শিখা। অতিথিগণ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন সদ্যোজাত শিশুতে। স্নেহের বাহু প্রসারিত করে দিলেন সতী অনসূয়া। দুধের শিশু স্তন্যপানের লালসায় ঝাপিয়ে পড়ল মাতৃবক্ষে। পরম যত্নে ও আদরে শিশু তিনটিকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন অনসূয়া।

এদিকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতী তাঁদের স্বামীদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। কোথাও পাচ্ছেন না তাঁদের খুঁজে। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন অত্রির আশ্রমে। বিস্ময়ে হতবাক। তাঁরা তাকিয়ে দেখলেন তাঁদের স্বামীদের অদ্ভুত রূপান্তরের দৃশ্য। বিস্ময়াবিষ্ট সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতী তপস্যায় বসলেন স্বামীদের ফিরিয়ে আনার জন্য। দেবীদের আরাধনায় খুশী হয়ে আবির্ভূত হলেন দেবাদিদেব। তিন শিশু ফিরে পেল তাদের স্বরূপ। অনসূয়ার সম্মুখে দাঁড়ালেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। অনসূয়ার ভ্রম ভাঙ্গল। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের পেলেন তিনি যথার্থ পরিচয়। লজ্জিতা হলেন অনসূয়া। মার্জনা ভিক্ষা করলেন তাঁদের পদতলে। ত্রি-দেব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন অনসূয়াকে বর প্রার্থনা করতে। অনসূয়া বললেন, "যদি আমার 'পর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন আপনারা, তবে এই বর দিন আপনাদের মত গুণ-সম্পন্ন পুত্র যেন আমার লাভ হয়।"

দেবতারা বললেন, "তথাস্তু।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন শূন্যে।

কাঠিন্যের শীলাসনে যিনি বসেছেন আদর্শ, নিষ্ঠা ও সত্যের দীপ জেলে, তাঁকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে দেবতাকেও মানতে হল পরাভব। নারী শক্তির আধার। পুরুষ নিষ্ক্রয় শিব। প্রকৃতি পুরুষকে তাঁর মায়ার কারাগারে আবদ্ধ করে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃসাধ্য কর্মে ঠেলে দেন। তাই তো শান্ত পুরুষটি তখন অশান্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় তার কর্ম জগতে অভিযান। মানুষ যা কিছু করে, প্রকৃতির তাগিদেই করে থাকে। প্রকৃতি যতক্ষণ জীবনে সক্রিয়, ততক্ষণ পুরুষ মহামায়ার কারাগারে আবদ্ধ।

অনুসূয়ার জীবনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে নারী শক্তি সিদ্ধা তাপসী তাঁকে দেবতারাও ব্রত ভঙ্গ করাতে পারেন না। আদর্শ, প্রেম, কর্তব্য ও ধর্মই ছিল তাঁর ধ্যানের মন্ত্র। তাইতো অনুসূয়া অর্গল-অয়নে হয়ে উঠলেন অর্চিষ্মান। পুরুষ বন্দী হল প্রকৃতির কারাগারে।

দেবতাদের বরে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবতার প্রতীম পুত্র মহর্ষী দত্তাত্রেয় করলেন জন্মগ্রহণ। দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে গেল অনসূয়ার সতীত্ব মহিমার অমর গাথা। পূজিতা হতে লাগলেন তিনি ঘরে ঘরে।

অরুন্ধতী

ব্রহ্মার মানস কন্যার নাম ছিল সন্ধ্যা। শাস্ত্র বলেন—এই সন্ধ্যাই একদা জন্ম গ্রহণ করলেন মর্তে। নাম হ'ল তাঁর অরুন্ধতী।

তাপসী সন্ধ্যা। কঠোর তপে মৌন স্তব্ধা। আত্মস্থা যোগিনীর মত লোহিত সাগরের তীরে চন্দ্রভাগা পর্বতে হলেন তিনি ধ্যান মগ্না। অন্তরে অরুন্তুদ আর্তি। প্রাণের পঞ্জর ভেদ করে জেগে ওঠে আরাধ্য-দেবতা বিষ্ণুর দর্শন-আকুতি। কিন্তু কৈ? কোথায় তুমি? আকুল অরুন্ধতী। বেদনার হিমছায়া পাতে বিমর্ষা। দর্শন তো মিলছে না। তবে কি, তবে কি তাঁর ধ্যান পথে কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে? না তো! তিনি তো কোনো অপরাধ করেন নি! তবে কেন, কি জন্যে জীবনের পরম প্রিয় জনের দর্শন থেকে হলেন সন্ধ্যা বঞ্চিতা?

দুর্ভর চিন্তায় শীর্ণা সন্ধ্যা। নয়নের কোণে কালির আলিম্পন। বিশুষ্ক বদন। বেদনার দাহে দেহ দুর্বল। শুধু ভাবেন আর ভাবেন। অবশেষে সন্ধান মিলল। কারণ খুঁজে পেলেন একটি।

কি সে কারণ?

তাপসী অরুন্ধতী অনেক পরে জানতে পারলেন তাঁর ত্রুটি। ধ্যানারম্ভের পূর্বে তিনি পাননি কোনো দীক্ষা। গুরু বৈ, কে পার করবেন প্রান্তরের সীমানা? কে এনে দেবেন অভীষ্ট বস্তুকে নয়না-লোকে? পারাপারের মাঝি কোথায়? কোথায় সেই পথের সাথীটি।

আকুল মন খুঁজে বেড়ায় গুরুকে। অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করেন, সেই পরম জনের আগমন প্রত্যাশায়।

নিষ্ঠার মন্দিরে শুচিশুদ্ধা তাপসী, তপোসিদ্ধির মন্ত্র প্রত্যাশী।

অবশেষে দয়ার উদ্রেক হল প্রজাপতি ব্রহ্মার অন্তরে। পাঠালেন বশিষ্ঠকে সন্ধ্যার কাছে। দীক্ষা পেলেন সন্ধ্যা, দীক্ষা পেলেন বশিষ্ঠের কাছে। বসলেন ধ্যানে। কঠোর তপস্যা। খুশী হলেন সন্ধ্যার আরাধ্য দেবতা। স্বয়ং বিষ্ণু এসে দান করলেন দর্শন। বললেন— 'তোমার তপে আমি পরম প্রীত। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

সন্ধ্যা ধন চাইলেন না। ঐশ্বর্য চাইলেন না। চাইলেন না রাজ্য, রাজত্ব অথবা বৈভব।

তবে কি চাই তাঁর?

তিনি চাইলেন পতিব্রতা বর।

বরদান করলেন বিষ্ণু, 'তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। এ জন্মে তোমার কঠোর তপের জন্য, তুমি আবার জন্মগ্রহণ করবে ঋষি মেধাতিথির যজ্ঞে। পর জন্মে পূর্ণ হবে তোমার মনস্কামনা। তুমি জগতের বুকে রেখে যেতে পারবে, সতীত্বের চরম আদর্শ। স্বামীর সঙ্গে চিরদিন অমলিন হয়ে থাকবে নক্ষত্র মণ্ডলে।"

কিছু কাল হল অতিক্রান্ত। মেধাতিথি আয়োজন করলেন জগতের হিতার্থে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের। আয়োজন করলেন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক স্নেহ-শান্ত তপোবনে। আমন্ত্রণ করলেন সকল দেবতাকে। সবাই এলেন। সন্তুষ্ট হলেন। করলেন সাধুবাদ। যজ্ঞ ভস্ম অপসারিত হচ্ছে। প্রচুর ভস্মরাশি। ক্রমে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়ল, এক পরমা সুন্দরী শিশু কন্যা। বিস্ময়ে অভিভূত ঋষি মেধাতিথি। তাকিয়ে রইলেন পলকহীন বিহ্বল নয়নে। অন্তরের নেপথ্যে শুনতে পেলেন, 'ইনিই হলেন ব্রহ্মার মানস কন্যা। পুণ্যবলে তিনি আবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইনি রেখে যাবেন জগতে এক পরম উজ্জ্বল আদর্শ।"

ছুটে গেলেন মেধাতিথি। ভস্ম রাশির মধ্য থেকে তুলে আনলেন কনকদীপ্তা শিশু কন্যা। পরম স্নেহে ধারণ করলেন বক্ষে। নাম রাখলেন অরুন্ধতী।

ঋষিদের মধ্যে বিবাহ প্রথা খুব সুপ্রচলিত নয়। খুব কম ঋষিই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, এঁদের শিষ্য থাকে অনেক। মেধাতিথিরও শিষ্য কিছু অপ্রচুর ছিল না। তাছাড়া তিনি বিবাহিতা। অরুন্ধতী ক্রমে বড় হতে লাগলেন বড় হতে লাগলেন, তাঁদের সকলের স্নেহে, যত্নে, লালনে ও রক্ষনে। মেধাতিথির পত্নী ও বহু শিষ্য এ কন্যাটিকে একান্ত কাছের করে নিলেন। করলেন শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শ স্থানীয়া। অরুন্ধতীর অন্তরে করুণার সঞ্চার হল। শুচিতায় স্নিগ্ধ হলেন। দেহের পাপড়িতে পাপড়িতে এলো বসন্তের লাবণ্য। রূপে রূপময়ী অরুন্ধতী। যৌবন ভারে লজ্জানতা। জ্ঞানে গরিমায়, গুণে গৌরবে এ যেন এক সাক্ষাৎ প্রেম-প্রতিমা।

একদা মেধাতিথির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন বশিষ্ঠ দেব। প্রথম দর্শনেই প্রাণ হরণের আকর্ষণ। মুগ্ধ হলেন বশিষ্ঠ দেব। নয়ন যেন আর ফেরাতে পারেন না। বিস্ফারিত আঁখি। অরুন্ধতীর রূপে লাবণ্যে, আকণ্ঠ নিমজ্জিত বশিষ্ঠ দেখলেন, অরুন্ধতীর আঁখিতারায় তাঁরই প্রতিচ্ছবি। উভয়ই উভয়কে মনে মনে একান্ত আপন করে নিলেন। বিচলিতা অরুন্ধতীর মনে হল, বশিষ্ঠদেবই তাঁর ইহকাল এবং পরকালের দেবতা। আর দ্বিধা নয়। ধীরে ধীরে কন্যা এগিয়ে গেলেন ঋষিপত্নীর কাছে। বললেন তাঁর অন্তরের একান্ত ইচ্ছাটির কথা। ঋষি পত্নী পরম খুশী। তিনি বললেন, ইনিই সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, পূর্ব জন্মে তোমাকে দীক্ষা দিয়ে, তোমার ইষ্টদেব বিষ্ণু দর্শনে সাহায্য করেছিলেন। ব্রহ্মার অভিলাষে এ জন্মে তিনি হবেন তোমার স্বামী। জ্ঞানে, কর্মে ও ধর্মে তাঁর সেবা করে, রেখে যাবে সতীত্বের পরম আদর্শ।"

মেধাতিথি বিনয়াবনত হয়ে, অরুন্ধতীর বিয়ের প্রস্তাব করলেন বশিষ্ঠ দেবের সমীপে। অরুন্ধতীকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। এমন একটি প্রস্তাব শ্রবণ করবার জন্যই, অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

শুভদিন শুভক্ষণ এলো। মেধাতিথি আমন্ত্রণ করলেন স্বর্গের সকল দেবতাকে। সকলে এসেছেন। এসেছে শুভ লগনটি। মেধাতিথি পরম আনন্দে, তাঁর আদরের দুলালীকে সমর্পন করলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠের হাতে। দেবতারা ধন্য ধন্য করলেন। অরুন্ধতী আজ সত্যিই সুখী। তাঁর বর হয়েছে মনের মত। সমস্ত অন্তর মন অরুন্ধতীর লুটিয়ে পড়ল স্বামীর পদপ্রান্তে। ইহকাল পরকালের আরাধ্য দেবতা, স্বামীর চরণে আত্ম সমর্পণ করলেন অরুন্ধতী। হলেন সুখী সুন্দর ও ধন্যা।

স্বামী সংসার নয়তো, এ যেন দেব মন্দির। অরুন্ধতী তারই পূজারী। ক্রমে শত পুত্র প্রসব করলেন অরুন্ধতী। শিক্ষা, দীক্ষায় জ্ঞানে, গুণে তারা হয়ে উঠলেন বশিষ্ঠদেবের মত। শত পুত্রের সংসার। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা। তার মধ্যে স্বামী সেবায়, বিন্দু বিচ্যুতি নেই অরুন্ধতীর। শক্তির দিক থেকেও তিনি কিছু কম ছিলেন না। স্বামীর মতই ক্ষমতা ধারণ করতেন অরুন্ধতী।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে একদা বশিষ্ঠদেবের প্রচণ্ড বিবাদ দেখা দিল। ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হল বশিষ্ঠের। তিনি উদ্যত হলেন, বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মশাপ দিতে। কিন্তু এ বড় ভয়াবহ অভিশাপ। আত্মিক শক্তির প্রচণ্ড স্ফুরণে, এ মহাশক্তি হয় ঋষিদের করায়ত্ব। কিন্তু এ অভিশাপ বর্ষণে, তাঁদের শক্তি যায় ক্ষয় হয়ে। ফলে রিক্ত নিস্ব হয়ে পড়েন তাঁরা। অবশেষে কঠোরতপে করতে হয় এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। দুই ঋষির দ্বন্দ্ব দেখে তাই ভীতা হলেন অরুন্ধতী। উপস্থিত হলেন গিয়ে সেখানে। ক্রোধদগ্ধ বশিষ্ঠকে নিবৃত্ত করলেন তিনি। ফিরিয়ে আনলেন, মহাপাপের পঙ্ক থেকে।

এমনি করেই অরুন্ধতী তাঁর স্বামীর পাশে পাশে ছায়া সঙ্গিনীর মত চির দিন বিরাজ করতেন। অবশেষে সতী অরুন্ধতী তাঁর পূণ্য বলে স্বামীর সঙ্গে চলে গেলেন স্বর্গে। বাস করতে লাগলেন সুখে ও আনন্দে। আজও তাঁরা সপ্তর্ষি মণ্ডলে অমলিন দীপ্তিতে উজ্জ্বল। জগতের মঙ্গল কামনায় সদা জাগ্রত। ধ্রুবতারা যাকে আমরা বলে

থাকি ঠিক তারই নীচে এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান। সাতটি নক্ষত্র নিয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল। মানে সপ্তঋষির সম্মেলন। আর এই সপ্তনক্ষত্রের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী ছোট্ট কিন্তু উজ্জ্বল, সেটিই হল আমাদের বশিষ্ঠের সহধর্মিনী অরুন্ধতীর প্রতীক। দেবলোকে ওকেই বলা হয় অরুন্ধতী।

হাজারো হাজারো যুগের ব্যবধান, কিন্তু আজও অরুন্ধতী হিন্দু-অন্তরে ভক্তির অভিসিঞ্চনে পুণ্যাস্নিগ্ধা। বিবাহবাসরে বসে বর এখনও নববধূকে আকাশের সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রটি দেখিয়ে দেন। আর বধূ ভক্তি বিনম্র চিত্তে তখন উচ্চারণ করেন "হে মহাসতী অরুন্ধতী, আমি যেন তোমারই মতন পতিপ্রেমের শুদ্ধ সরোবরে একীভূতা হয়ে যাই। তোমারই মতন যেন তাঁর চরণে আজন্মের সঙ্গিনী হয়ে থাকি।"

সীতা

ক্ষেত্র কর্ষণ করতে গিয়ে রাজর্ষি জনক লাভ করলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা। এ আবার কেমন সংবাদ? রাজর্ষি যিনি, তিনি কেন কর্ষণ করতে যাবেন ক্ষেত্র? হ্যাঁ, করে ছিলেন। একটি যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে তাঁকে জমি চাষ করতে হয়েছিল একদা।

মাটির বুক থেকে লাঙ্গলের ফলা তুলে আনল এক দেবী মূর্তি। নাম দেওয়া হল তাঁর সীতা। আরো একটি নাম ছিল তাঁর। জনক ঋষির কন্যা। তাই তাঁকে অনেকে সোহাগভরে সাদর করে ডাকত—'জানকী' নামে।

সুন্দরী সীতা। রূপের অমরা। লাবণ্যের স্নিগ্ধতা। এ রূপ দেখলে আর নয়ন ফেরান যায় না।

ক্রমে ক্রমে সীতা এসে দাঁড়ালেন বয়সের সন্ধিক্ষণে। যৌবনের ঢল নামল তার দেহের প্রতিটি পাঁপড়িতে। চপলা সীতা। যুবতী সীতা। সব ধর্মে, সর্ব শাস্ত্রে সু অভিজ্ঞা। পিতার আশীর্বাদ পুষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিতা।

সীতার পানে তাকিয়ে রাজর্ষি জনক মনে মনে স্থির করলেন, উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা দরকার। কিন্তু কি ভাবে পাত্রের উপযুক্ততা বিচার হবে?

বহু সাধন লব্ধ হরধনু ছিল ঋষি জনকের ঘরে। তিনি ঘোষণা করলেন—এই হরধনু যে ভঙ্গ করতে পারবে তার হাতেই সম্প্রদান করব আমার কন্যা।

সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল চতুর্দিকে। বহু দেশ দেশান্তর থেকে আসতে লাগলেন রাজকুমারগণ। তাদের চেষ্টার তো বিরাম নেই।

কিন্তু সামর্থ হল কজনার? ধনুক ভাঙ্গা তো দূরের কথা, তা কেউ তুলতেই পারলেন না। এমন কি লঙ্কার রাজা রাবন ছদ্মবেশে এসেও হলেন অকৃতকার্য। লজ্জা পেলেন তিনি। হলেন ক্ষুব্ধ। বিদায় নিলেন মাথা নত করে পরাভূত সৈনিকের মত।

এতো হল। কিন্তু তবে কে এসে বরণ করবে এ কন্যা? কে এসে পরিয়ে দেবে জানকীর কণ্ঠে বরমাল্য?

জনক রাজা পড়লেন মহা দুশ্চিন্তায়।

কিছু ভাবনা নেই। সব চিন্তার অবসান করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র।

কি ভাবে? সে এক কাহিনী।

তাড়কা রাক্ষসীর অত্যাচারে অস্থির সবাই। কেউ পারে না তাকে দমন করতে। বিশ্বামিত্র এলেন অযোধ্যায়। রাজা দশরথকে নিবেদন করলেন সব সংবাদ। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন রাম লক্ষণ দুই ভাইকে তাড়কা বধ করতে। তাড়কা বধ হল। ঋষি বিশ্বামিত্র দু ভাইকে নিয়ে চলে এলেন জনকের সভায়। রামকে আদেশ করলেন বিশ্বামিত্র হরধনু ভাঙ্গতে। বিনা ক্লেশে হরধনু ভঙ্গ করলেন শ্রীরামচন্দ্র। এ শুভ সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল চতুর্দিকে। গর্বিত পিতা দশরথ চলে এলেন মিথিলায়। আবদ্ধ হলেন রাম সীতা বিবাহ বন্ধনে। শুধু কি তাই? জনকের তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রীর পানি গ্রহণ করলেন রাজা দশরথের অপর তিন পুত্র। পরম সুখে ও আনন্দে রাজা দশরথ সীতাসহ নববধূদের নিয়ে ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যায় ফিরেছেন দশরথ। তাঁর কি আর আনন্দের সীমা আছে। পরম সুখে ও শান্তিতে বেশ কয়েকটা বছর হল অতিক্রান্ত। বৃদ্ধ হয়েছেন রাজা দশরথ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এসেছে চিন্তা। দেহ ভেঙ্গেছে। মন ক্লান্ত। আর রাজকার্যে নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখতে চান না। তাই শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে

চাইলেন তিনি। কিন্তু প্রচণ্ড অন্তরায় হয়ে দেখা দিলেন রাণী কৈকেয়ী। প্ররোচনা গ্রহন করলেন তিনি দাসী মন্থরার কাছ থেকে। নিজ পুত্র ভরতকে রাজা করবার অপচেষ্টায় কৌশলে শ্রীরামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। স্থির হল শ্রীরামচন্দ্রের বন গমন।

এবারে শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় পর্ব। একে একে সকলের কাছ থেকেই বিদায় গ্রহণ করলেন তিনি। অবশেষে গিয়ে ব্যথিত চিত্তে হাজির হলেন জানকীর কাছে। ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন শ্রীরামচন্দ্র, 'জানকী, ভেবেছিলাম সুখেই দিন কাটবে মোদের। কিন্তু বিধাতার তা ইচ্ছা নয়। তাই আমাকে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যেতে হচ্ছে। দুঃখ করনা। তুমি এই চৌদ্দ বছর গুরুজনদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রো। এবারে আমাকে বিদায় দাও।'

কিন্তু সীতা সম্মতি দিতে পারলেন না। তিনি বিনীত বিনয়ে বলতে লাগলেন, 'এ তুমি কি বলছ। তুমি বনে যাবে, আর আমি কি সুখে থাকব রাজপ্রাসাদে, বলতো? তুমিই তো বলেছ, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের অন্য কোনো গতি নেই। যদি তাই হয় তবে তো তুমি আমার একমাত্র গুরু। যেখানে যেভাবে আমার গুরু থাকবেন, আমি তাঁর সঙ্গে সেইভাবে দিনাতিপাত করব। তুমি বনে গেলে আমি তোমার দাসী হয়ে করব তোমার অনুগমন। দাসীর সেবায় তোমার বনযাপনের দুঃসহ কষ্টের অনেক লাঘব হবে।'

সীতার কথা শ্রবণ করে শ্রীরাম চন্দ্র পরম প্রীত হলেন বটে, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে বনে বিচরণ করা যে কত কষ্টকর, তা বলতেও কসুর করলেন না তিনি। সব শুনলেন সতী জানকী। বিরত হলেন না তবুও। তাই আবার বলতে লাগলেন, "তোমার সঙ্গে বনমাঝে বসে মনে করব এই আমার স্বর্গ। ধূলি-ধূসরিত হলে মনে করব এ আমার অঙ্গে চন্দন অনুলেপন। শরীর কুশকণ্টকে বিদ্ধ হলে তাকে মন গ্রহণ

করবে তোমার স্নেহ চুম্বন বলে। তুমি যদি না আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তবে আমি নিশ্চিত মরে যাব।"

শ্রীরামচন্দ্র কিছুতেই পারলেন না তাঁকে রেখে যেতে। আগে চললেন রাম। পেছনে সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ। অযোধ্যায় নেমে এল অন্ধকারের যবনিকা। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ গমন করলেন বনে।

এ আঘাত দুঃসহ। বৃদ্ধ দশরথ পুত্র শোকে এক রকম দিশেহারা। আর প্রাণ ধারণ করতে চাইলেন না তিনি। দেহ ত্যাগ করলেন বড় বেদনাময় অসহায় অবস্থার মধ্যে।

ওঁরা এসে উপস্থিত হলেন চিত্রকূট পর্বতে। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই ভরত এলেন পাগলের মত ছুটে। দাদাকে তিনি ফিরিয়ে নেবেনই। কিন্তু রাম পিতৃ সত্য পালন হেতু এসেছেন বনে। ফিরে গেলে যে পিতার বিদেহী আত্মা কষ্ট পাবে। নানা ভাবে বুঝিয়ে ভরতকে আশ্বস্ত করলেন রাম। নিরুপায় ভরত। দুচোখে তাঁর বেদনার অশ্রু নির্ঝর। অবশেষে দাদার পাদুকা মস্তকে ধারণ করে তা নিয়ে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। পাদুকার নীচে স্থাপন করলেন রাজ সিংহাসন। দাদার প্রতিভূ হিসেবে চালাতে লাগলেন রাজ্য।

বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করলেন শ্রীরামচন্দ্র। শেষে উপনীত হলেন এসে পঞ্চবটী বনে। নির্মাণ করলেন কুটির। বাস করতে লাগলেন তিনজনে। কিন্তু এখানেও শান্তি নেই। বড্ড রাক্ষসের অত্যাচার।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। লঙ্কার রাজা রাবণের বোন শূর্পণখা বনে বিচরণ করতে করতে দেখতে পেলেন রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে। মুগ্ধ হলেন শূর্পণখা। ওদের রূপে গেল তাঁর নয়ন জুড়িয়ে। প্রলুব্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। চাইলেন রামকে বিয়ে করতে।

কিন্তু এ প্রস্তাব করা মাত্রই শূর্পনখা দু ভাইয়ের কাছে হলেন নানা ভাবে অপমানিতা। দুঃখে বেদনায় শূর্পনখা আনত মস্তকে চলে গেলেন সেখান থেকে। কিন্তু সংবাদটি গিয়ে পরিবেশন করলেন ভাইয়ের

কাছে। সীতার রূপের কথাও বললেন তিনি রাবণের কাছে। রাবণ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠলেন। সীতাকে হরণ করার জন্য পাঠালেন মারীচ নামে এক রাক্ষসকে। সঙ্গে তিনিও এলেন।

মারীচ ধারণ করল ছদ্মবেশ। হল একটি অপূর্ব স্বর্ণমৃগ। বড্ড ভালো লাগল রামচন্দ্রের। ওটিকে ধরবার জন্য চললেন তার পিছু পিছু। চলে এলেন অনেকটা দূরে। এক রকম কৌশল করেই রামচন্দ্রকে কুটির থেকে বের করে নিয়ে এল রাক্ষস মারীচ।

এই তো সুযোগ। দুষ্ট দশানন ধারণ করলেন এক সন্ন্যাসীর বেশ। এলেন সীতার কুটিরে।

সন্ন্যাসী দ্বারে উপস্থিত। তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া তো কুটিরবাসীর পরম কর্তব্য। সীতা এলেন ভিক্ষা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে নিজ মূর্তি ধারণ করলেন রাবণ। সবলে সীতাকে তুলে নিলেন রথে। পলায়ন করলেন সঙ্গে সঙ্গে। সীতা হলেন রাবণের বন্দিনী। বাস করতে লাগলেন লঙ্কায়।

রাম কুটিরে ফিরে দেখলেন সীতা নেই। বিরহ বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন রামচন্দ্র। বড় দুঃখে কাটতে লাগল তাঁর দিনগুলো।

নানা পথে নানা বনে দুভাই মিলে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলেন সীতাকে। অবশেষে পেলেন তাঁর সন্ধান। কিন্তু কিভাবে তাঁকে উদ্ধার করা যাবে? ভাবতে লাগলেন দুটি ভাই। অবশেষে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন সুগ্রীব ও হনুমানের সঙ্গে। বানরগণ হল তাঁর পরম হিতৈষী সুহৃদ।

বায়ুনন্দন হনুমান সাগর পার হয়ে গেলেন এক লাফে। উপনীত হলেন এসে লঙ্কায়। সন্ধান করে জানলেন সীতার অবস্থান। তিনি চেড়ীবেষ্টিত হয়ে আছেন অশোক কাননে। কি করে যাবেন তিনি জননী সীতার কাছে। খুঁজতে লাগলেন সুযোগ। চেড়ীগণ যে যার কাজে চলে গেল এক সময়ে। কেউ নেই। সীতা একা। হনুমান

এসে উপস্থিত হলেন। বললেন গিয়ে সীতার কাছে, 'বহু ক্লেশ ও চেষ্টার পরে তোমার সন্ধান পেয়েছে তোমার স্বামী। দেবী, আমাকে তিনিই পাঠিয়েছেন তোমার সমীপে। তুমি এখানে এ ভাবে আছো জানতে পারলে তিনি সসৈন্যে লঙ্কা আক্রমন করে তোমাকে উদ্ধার করতে আসবেন।'

সীতা অপলক। দৃষ্টি তাঁর ক্ষীণ। মলিন বসন। জীর্ণ বেশ। বড় ক্লান্ত। বড় অসহায় ভাব তাঁর।

হনুমানের অন্তর কেঁদে উঠল। বললেন তিনি, 'মা, তোমার বড্ড কষ্ট। যদি একে বারেই অসহ্য হয়ে থাকে, তবে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। আমি এক লাফে সাগরের ওপারে চলে যাব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে।'

সীতা বললেন, 'না বৎস, চোরের মত পালিয়ে যাবার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। আছে ভীরুতা ও কাপুরুষতা। আমি ও ভাবে যাব কেন?'

হরধনুভঙ্গকারী শ্রীরামচন্দ্রের ভার্যার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সত্যিই অকল্পনীয় ব্যাপার। তাই হনুমানকে ফিরে যেতে হল বিফল মনোরথ হয়ে।

এ বারে নব উদ্দমে প্রস্তুতি চলল। জননীর মুখ দর্শন করে যেন নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে তাঁর মধ্যে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুগত দাস, প্রভুর আশীর্বাদই তার সাফল্যের উৎস। হনুমান-বাহিনী নেমে পড়ল সেতু বাঁধতে। ভারতের উপকূল থেকে একেবারে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত বাঁধল এক সুদীর্ঘ সেতু। শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে ঝড়ের বেগে তাঁরা এগিয়ে এল লঙ্কার পথে। রাবণের কবল থেকে ছিনিয়ে নিলেন সীতাকে। চলে এলেন স্বদেশে।

কিন্তু বিঘ্ন দেখা দিল একটি।

কি?

দীর্ঘদিন রয়েছেন সীতা পরবাসে। প্রজাদের মনে যদি সন্দেহের

ছায়াপাত ঘটে থাকে কিছু ? তারা যদি সীতার চরিত্রে আরোপ করে বসে কলঙ্ক ? নানা প্রশ্নের শর বর্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র। অবশেষে আয়োজন করলেন অগ্নিপরীক্ষার। সাধ্বী সতী সীতা অনুমোদন করলেন স্বামীর আয়োজনের। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সীতা ধীর পদ সঞ্চারে এগিয়ে চললেন। দাঁড়ালেন অগ্নিসিদ্ধা সীতা। আগুন তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। জয় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সতী পরম গৌরবে ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যায় আনন্দের ঢল নামল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত দাদার পাদুকা সিংহাসনে রেখে এতদিন করেছেন রাজ্য পরিচালনা। এবারে শ্রীরামচন্দ্রকে এনে বসালেন সিংহাসনে। অযোধ্যার জীবন থেকে হল দুঃখের অবসান।

কিন্তু দুঃখের অবসান হল না সীতার। অগ্নি পরীক্ষা তো হয়ে গেল। প্রজারা তো তা স্বচক্ষে দেখেনি কেউ। কাজেই মিথ্যা একটি কলঙ্কের কালো মেঘে আকীর্ণ হল প্রজাদের মন। সীতা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান। সংবাদটি ভেসে এল শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণে। তিনি বেদনায়, দুঃখে নীরব হয়ে গেলেন। মনে মনে স্থির করলেন, 'প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে দেব বিসর্জন।' লক্ষ্মণ যাত্রা করলেন সীতাকে নিয়ে। রেখে এলেন বাল্মীকির তপোবনে।

নীরব সীতা। দুচোখে তাঁর নীরব অশ্রুর উচ্ছাস। অন্তঃস্বত্ত্বা সতী। স্বামীসঙ্গহারা। বন হল তাঁর আশ্রয়ের আবাস। প্রকৃতি হল তাঁর প্রহরী। প্রজা পালক শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রজাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই তাদের পানে তাকিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বনে পাঠাতেও করলেন না বিন্দু দ্বিধা। প্রজা পুত্রের চেয়ে বড়। প্রজা পত্নীর চেয়ে বড়। তাদের মনোরঞ্জন করা যে আদর্শ রাজার পবিত্র কর্তব্য।

এদিকে বাল্মীকির কুটিরে সীতা দেবী প্রসব করলেন যমজ দুটি পুত্র

সন্তান। রাম কিছু জানলেন না। লক্ষ্মণের কানেও পৌঁছলনা সে সংবাদ। ক্রমে বড় হতে লাগল তারা। বাল্মীকি যথা সময়ে তাদের করে তুললেন শাস্ত্রজ্ঞ। শিক্ষা দিলেন অস্ত্র বিদ্যায়। মুনিবর তাঁর দিব্য জ্ঞান দ্বারা পূর্বেই রচনা করেছিলেন রামায়ণ। এক বৃন্তের দুটি ফুল—লব আর কুশ। দুভাইকে বাল্মীকি শেখালেন রামায়ণ গান। পুত্রদের মুখে সে গান শুনে সীতাদেবী হয়ে যেতেন মুগ্ধ। মাতৃহৃদয় আনন্দে ও গর্বে উঠত ভরে। তখনকার মত তিনি ভুলে যেতেন স্বামীবিরহের অনলদহন।

এ দিকে শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে স্থির করলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কেন? এ যজ্ঞ করতে যে চাই স্ত্রীকেও। কোথায় সীতা? তিনি যে বনবাসে। তাঁকে তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এখন উপায়? শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মনের মাধুরী দিয়ে তৈরী করালেন—স্বর্ণ সীতা। নিমন্ত্রণ করলেন সমস্ত মুনিদের। বাল্মীকি পেলেন আমন্ত্রণ। এলেন তিনি লব কুশকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞে। করালেন তাঁদের দিয়ে রামায়ণ গান। সকলে সে পালা গান শুনে মুগ্ধ হলেন। শ্রীরামচন্দ্র হলেন অভিভূত। সীতা স্মৃতি করল তাঁকে আকুল। অস্থির রামচন্দ্র। বাল্মীকি এই সুযোগে সীতাকে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়। রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন সীতাকে গ্রহণ করবার জন্য।

কিন্তু আবার গুঞ্জরিত হয়ে উঠল সীতার সতীত্বের পরীক্ষার কথা। অপমানে অসম্মানে সীতার এলো আত্মধিক্কার। ঘৃণায় দুঃখে তিনি হাহাকার করে উঠলেন। দুচোখ বেয়ে নেমে এল বেদনার অশ্রু। জীবনের 'পর আর বিন্দু মায়া নেই তাঁর। আর ইচ্ছে নেই একটি মুহূর্তও বেঁচে থাকতে। থর থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। এ মর্মান্তিক অসম্মান তাঁকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলল—জীবন বিসর্জন দিতে। তিনি আর্তকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন—

বসুন্ধরে, দ্বিধা হও। আমাকে তোমার ঐ অপার শান্তির অঙ্কে আশ্রয় দাও।

মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন সীতা। সভাস্থল হল দ্বিখণ্ডিত। পাতাল থেকে দুটি কনক বাহু হল প্রসারিত। পরম স্নেহে সীতাকে টেনে নিলেন কোলে। পাতালে প্রবেশ করলেন পরম সতী সীতা। সব পরীক্ষায় অবসান হয়ে গেল। প্রজাদের সকল প্রশ্নের নির্ভুল সমাধান করে দিলেন তিনি। পৃথিবীর কন্যা পৃথিবীতে লীন হয়ে গেলেন।

রাজমহিষী শৈব্যা

গভীর অরণ্য। ঘন সবুজের আদিগন্ত বিস্তার পথ বিপদ সঙ্কুল। কোথাও অন্ধকার। কোথাও ক্ষীণ আলোর রশ্মিরাজি তারই মধ্যে ধীর পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন এক সুঠাম সুদর্শন যুবক।

হাতে ধনুর্বাণ। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি গতি মন্থর। মন ভরা মৃগয়ার অভিলাস।

কিন্তু কৈ ?

শিকার তো জুটছেনা। তবে কি, তবে কি বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে ?

সহসা একটা শব্দ হল। যুবক দাঁড়ালেন থমকে। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বিস্ফারিত করে দিলেন দৃষ্টি দূরদিগন্তে। এবারে আর ধীর গতি নয়। ত্রস্ত হল পদপাত। চোখে মুখে ফুটে উঠল ক্রোধের ক্লিষ্টতা। প্রশ্নের শরবর্ষণে বিদ্ধ হল অন্তর।

কে, কে কাঁদছে ? কার কণ্ঠস্বর ? কার আর্ত ক্রন্দন আমার অন্তরকে মথিত করল ?

আরো এগিয়ে গেলেন যুবক। খানিকটা এগিয়ে দাঁড়ালেন থমকে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত আঁখি। অসহ্য যন্ত্রণায় যুবক সহসা তিরস্কার করে উঠলেন। ফিরে তাকালেন ঋষি। অগ্নিবর্ষি চোখ। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল। তাকিয়ে রইলেন তিনি যুবকের মুখপানে।

কিন্তু যুবক নিশ্চল। দ্বিধাহীন চিত্ত। একটুও পেলেন না ভয়। বলে চললেন অবিরাম—'ছিঃ, ছিঃ ছিঃ! এ আপনি কি করছেন। একটি অসহায় নারী নিয়ে আপনি পৈশাচিক কার্যে রত।'

নির্বাক ঋষি। স্তব্ধ শান্ত। রাত্রির মত মৌন গম্ভীর।

তিনি ত্রি-বিদ্যা সাধন করছিলেন এক নারীকে নিয়ে। সে কথা জানতেন না যুবক। জানতেন না ঋষির যথার্থ পরিচয়। ইনি আর কেউ নন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

যুবকের তিরস্কারে তাঁর সমস্ত চেতনার মধ্যে আছড়ে পড়ল ক্ষ্যাপা নদীর ঢেউ। ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। উদ্যত হলেন অভিশাপ দিতে। যুবক করজোড়ে করলেন ক্ষমা ভিক্ষা। বিরত করলেন ঋষিকে। আত্মপরিচয় প্রদান করলেন যুবক : বললেন—'সূর্যবংশের রাজা আমি। নাম হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা আমার মহিষী। বহু প্রার্থনায় আমরা লাভ করেছি একটি পুত্র সন্তান। রোহিতাশ্ব বলে সে পরিচিত। আপনি আমাদের এ সুখের সংসারকে অভিশাপ দিয়ে অসীম দুঃখের দরিয়ার নিক্ষেপ করবেন না।'

ঋষি অভিশাপ দিতে বিরত হলেন বটে, কিন্তু বললেন—'বেশ অভিশাপ তোমাকে আমি দিলাম না। কিন্তু তুমি রাজা। এখন তোমার কি কর্তব্য বল?'

রাজা হরিশ্চন্দ্র বললেন—'এখন আমার একমাত্র কর্তব্য হল দান।'

ঋষি বললেন—'কি দান করবে তুমি আমাকে?'

রাজা দান করে বসলেন ঋষিকে তাঁর সদ্বীপা পৃথিবী। স্বীকৃত হলেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা স্বরূপ দান করতে। শুধু কি তাই? সময় নিলেন মাত্র তিন দিন।

সুখের সায়রে নেমে এলো দুঃখের শর্বরী। মর্মদীর্ণ হাহাকারে ভেঙ্গে পড়লেন রাজা। ত্রেতাযুগের অভিশপ্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার মর্মান্তিক বেদনার সূচনা হল এক অসহায় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে।

সসাগরা সদ্বীপা সাম্রাজ্য দান করলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রকে। সুতরাং তাঁর অধিকারে কি রইল? রাজকোষ তো দূরের কথা, একমুঠো ধূলা স্পর্শ করবারও অধিকার নেই আজ রাজা হরিশ্চন্দ্রর। কি করে দক্ষিণা প্রদান করবেন ঋষি কে?

কঠোর তপা বিশ্বামিত্র বললেন—'আমাকে দেওয়া তোমার পৃথিবীর মধ্যে তুমি আর বাস করতে পারবে না।'

যুক্তিযুক্ত নির্দেশ। নিজদেশে নিজে আজ পরবাসী—হরিশ্চন্দ্র। কোথায় যাবেন তিনি? কে দেবে তাঁকে অভয়ের আশ্রয়? দুঃখের আঁধার রাত্রিরা এসে বারে বারে হানা দিতে লাগল—রাজা হরিশ্চন্দ্রের দ্বার প্রান্তে। দিশাহারা রাজা। মনে মনে স্থির করলেন তিনি, চলে যাবেন বারানসী। কেন? পৃথিবীর বাইরে বলতে আছে মাত্র এই একটি স্থান। স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁর ত্রিশূলে ধারণ করে আছেন বারানসীকে। পৃথিবীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে বারানসী। দেবতার আবাস স্থল। এখান থেকে কেউ প্রত্যাখ্যাত হয় না। রাজা তাই চলে এলেন বারানসী ধামে। আর রাজমহিষী শৈব্যা?

তিনিও রাজকুমার রোহিতাশ্বের হাত ধরে পথে নামলেন। রাজেন্দ্রাণী হলেন পথের ভিখারিণী। নিরাভরণা। ছিন্ন বস্ত্র। মলিন বেশ। রুক্ষ কেশ। বেদনাহত পাণ্ডুর মুখশ্রী। সন্তানের হাত ধরে স্বামীর সঙ্গে তিনিও নামলেন পথে।

এ দিকে দক্ষিণা দানের শেষ দিনটি হল উপস্থিত। ম্রিয়মান রাজা। চিন্তাভ্রষ্ট। এক কপর্দক হাতে নেই। রাত পোহালে কি করে তিনি দান করবেন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা!

যার কেউ নেই, তার কি তুমিও থাকবেনা? কাতর মিনতি নিবেদন করতে লাগলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র অশ্রুস্তিমিত নয়নে ভগবানের উদ্দেশে। আর স্মরণ করলেন ধর্মরাজকে—'হে ধর্ম রাজ! তুমি কৃপা কর। দয়া কর। আমি যেন অধর্মে পতিত না হই!'

তখন ছিল দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত। বারানসীর একজন ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে কিনে নিলেন মাত্র পাঁচশত সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে। আর রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে নিজে বিক্রি করলেন এক চণ্ডালের কাছে। পেলেন তার কাছ থেকে বাকী পাঁচশত সুবর্ণ

মুদ্রা। ধর্ম রক্ষা হল রাজা হরিশ্চন্দ্রের। চিহ্নিত সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করে দিলেন বিশ্বামিত্রের দক্ষিণার মুদ্রা।

উভয়ের এবার ছাড়াছাড়ির মর্মন্তুদ মুহূর্ত্তটি হল উপস্থিত। আঁখি বারির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল সে অধ্যায়। রোহিত চলে গেল মায়ের সঙ্গে।

মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করেছেন ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে। ক্রীতদাসীর সন্তান রোহিতকে অন্নদানে সম্মত নন তিনি। রাজপুত্র আজ এক মুঠো অন্নের কাঙ্গাল। শৈব্যার আহার্য থেকে অর্ধেকটা অন্নে প্রতিপালিত হতে লাগল কুমার। এক রকম অনাহারে কাটতে লাগল শৈব্যার দিনগুলো। দেহ গেল ক্ষীণ হয়ে। নয়নের কোলে দেখা দিল কালির আলিম্পন। এককালের সুন্দরী শৈব্যা আজ অবহেলার অনাদরে ম্লান। বিষণ্ণ।

এতটা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে থেকেও স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় তিনি তন্ময়। তাঁর ধর্ম রক্ষার অর্ধেকটা দায়িত্ব শৈব্যার। স্বামীর কথা তাঁর সমস্ত দুঃখ বেদনাকে দেয় ভুলিয়ে। অনাহার অর্ধাহারের ক্লিষ্টতাকে মুছে দেয় মন থেকে।

কি হবে! কবে এ অন্ধকার রজনীর অবসান হবে। কবে দেখা দেবে প্রত্যুষের প্রসন্নতা! মাঝে মাঝে একথা ভাবেন। কিন্তু দুঃখের দিন তো একা আসে না। নানা মূর্ত্তিতে তার আত্মপ্রকাশ।

সে দিন রোহিতাশ্ব পূজার পুষ্প চয়ন করতে গেল বাগিচায়। ছোট্ট ছেলে। ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে তুলতে যাচ্ছিল ফুল। বিধি হলেন বাম। নিয়তির নির্মম নির্দেশে কাল সর্পে দংশন করল তাকে। চির দিনের মত ঢলে পড়লো রাজকুমার। পাগলিনী শৈব্যা হাহাকার করে উঠলেন। জড়িয়ে ধরলেন বক্ষে। মায়ের অঙ্কে হরিশ্চন্দ্রের শেষ সাক্ষি আজন্মের নিদ্রায় শায়িত হল। নিভে গেল শৈব্যার অন্তরের শেষ প্রদীপটি। দাসীর আবার শোক! কেউ করল না সে দিকে কর্ণপাত! মৃত ছেলেকে বুকে জাপটে পথে নামলেন শৈব্যা। অনাথিনীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত হয়ে গেল। একাই

চললেন শৈব্যা তার রোহিতকে নিয়ে শ্মশান বহ্নিতে দেহ দাহ করতে।

রাত গভীর। চতুর্দিকে অন্ধকার। আকাশ মেঘ-মন্দ্রিত। মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। এই নিদারুণ দুর্যোগের মধ্যে শৈব্যা তাঁর মৃত ছেলে নিয়ে এসে উপনীত হলেন শ্মশানে। শ্মশান শিয়রে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে অসহায়ের মত কাঁদতে লাগলেন শৈব্যা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ডোম। বলল—'আমার পাওনা রেখে তুমি চলে যাও। আমিই দাহ করব তোমার পুত্রকে।'

ডোমের কথা শুনে হাহাকার করে উঠলেন শৈব্যা—'আমি যে নিঃস্ব। কপর্দকহীনা। স্বামী আমার জীবিত। কিন্তু তবুও আমি ক্রীতদাসী।'

শৈব্যার কথা শ্রবণ করে ডোম বলতে লাগল—'কি নিষ্ঠুর এ সন্তানের পিতা! পুত্র মৃত। স্ত্রী গিয়েছেন পাগল হয়ে। তবুও স্বামীর নামে দেখা নেই।'

শৈব্যা প্রতিবাদের কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—'এই বিপদ শঙ্কুল দুর্যোগময়ী শ্মশানে একমাত্র আপনিই আমার বন্ধু চণ্ডাল রাজ। বন্ধু হয়ে আশাকরি আপনি আমার স্বামী নিন্দা করবেন না। স্বামীর তুল্য স্ত্রীলোকের কাছে আর কি বড় আছে? ধর্মরক্ষার্থে তিনি আমাদের এরূপ ভাবে রেখেছেন।'

কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন শৈব্যা। পেছনের দিনগুলো এসে ছায়ার মত দাঁড়াল তাঁর মনের নেপথ্যে। তিনি কান্নার মধ্যেই ব্যক্ত করলেন তাঁর পরিচয়। বললেন ছেলের নামটি পর্যন্ত।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ডোম। তার এত দিনের ডোম জীবনে এমন তো কেউ আর আসেনি! তবে কি-তবে কি সত্যিই এই সেই শৈব্যা! আর তাঁরই ছেলে রোহিতাশ্ব!

না-না, তা নয়। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা আর রোহিতাশ্ব জগতে আরো অনেক-অনেক আছে-এরাও নিশ্চয় তাদেরই কেউ।

সহসা আকাশের পটে একটা চাবুক কশাল বিদ্যুৎ। ভাস্বর হয়ে উঠল সব কিছু। ডোমরূপী হরিশ্চন্দ্র দেখে নিলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে ভাল করে।—'আমার রোহিত',—বলে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন হরিশ্চন্দ্র। দুঃখের শিয়রে উভয়ের পরিচয় হল নতুন করে। জ্ঞান ফিরে এল ডোম হরিশ্চন্দ্রের। চাইলেন তিনি ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে জীবন যন্ত্রনার অবসান ঘটাতে।

দুর্বল নারী শৈব্যা হতবাক। স্তম্ভিতা। কি করবেন তিনি? পুত্র হারিয়েছেন। এবারে স্বামীকেও হারাতে বসেছেন তিনি। মনে মনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—'হে ঈশ্বর।'

ঠিক এমনি এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্র। মৃত রোহিতাশ্বকে যোগ বলে করলেন জীবিত। সত্যনিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে করলেন দুহাত তুলে আশীর্বাদ। প্রত্যর্পণ করলেন তাঁর পৃথিবী। দুঃখের রাত্রির অবসান হল শৈব্যার।

স্বামী ও পুত্রের হাত ধরে ফিরলেন তিনি রাজ অন্তঃপুরে।

দময়ন্তী

বিদর্ভের রাজ অন্তঃপুরে ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। প্রবল প্রতাপ রাজা ভীম। প্রাচুর্য্যের মধ্যে দিন যাপন করেও তাঁর অন্তর নিরন্তর হাহাকার হতাশায় কাল গুণে চলেছে। এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করবে? কার হাতে রাজা ভীম অর্পণ করে যাবেন এ অন্তঃপুরের দায় দায়িত্ব?

দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসে। সুখের শঙ্খ বেজে উঠে। দেখা হয়ে যায় রাজা ভীমের সঙ্গে দমন মুনির। বিনীত বিনয়ে রাজা নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের প্রার্থনা। বলেন—'হে মুনিবর! আমরা নিঃসন্তান। আপনি আমাদের সন্তান বরে ধন্য করুন।'

মুনি খুশী মনে দান করলেন বর। ক্রমে ক্রমে দুটি সন্তান এল তাঁদের ঘরে। কন্যার নাম রাখা হল দময়ন্তী। আর পুত্রের নাম রাখা হল দমন। দময়ন্তী আর দমন। ভীমের আঁধার ঘরের দুটি আলো। সুখের জোয়ার বইল। আনন্দের বান ডাকল। রাজা ভীমের মেঘাকুর্ণ মনে দেখা দিল প্রভাত সূর্য।

দময়ন্তীর দেহে রূপ ধরে না। গুনে সে গুনবতী। সবাই তারে ভালবাসে। তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে! যৌবনা যুবতী দময়ন্তীর রূপ মুগ্ধ করে দেয় সকলকে। বিস্তৃতি লাভ করে তার রূপের ছটা চতুর্দিকে। এমন কন্যার কণ্ঠে কে পরাবে মালা? কোন পুরুষ লাভ করবে তার প্রসন্ন সান্নিধ্য!

রাজার চিন্তার অন্ত নেই। রাজা অবশেষে ঘোষণা করলেন দময়ন্তীর—স্বয়ংবর।

রাজকন্যা দময়ন্তী। অতুলন তার ঐশ্বর্য। মনে তার মগ্নতা।

প্রাণে লেগেছে প্রসন্নতার পরশ। পিতা ঘোষণা করেছেন তার স্বয়ংবর। এ সংবাদ তাকে আনন্দ দেয়। চাঞ্চল্যের ছোঁয়ায় করে উজ্জীবিত। কখনো বা হয় মনের দিগন্তে নানা প্রশ্নের শরবর্ষণ। কেমন হবে! কি হবে! কে আসবে।

সে দিন ঘটল একটি ঘটনা। দময়ন্তী ভ্রমণ করছিল এক উপবনে। সহসা এল একটি রাজহংস। দময়ন্তী গেল এগিয়ে। ধরল হংসটি ঝাপটে। হংসটি তার ভাষায় বুঝিয়ে বলল দময়ন্তীকে—আমায় তুমি ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে নলের সংবাদ দেব।'

দময়ন্তী এর আগে অনেক বার শুনেছে নলের কথা। নলের রূপ আছে। গুণ আছে। আছে তার খ্যাতি। শুধু কি তাই? নলকে না চেনে কে? মনে মনে নলকে ভালোবেসে ফেলেছে দময়ন্তী। পরেছে আসক্ত হয়ে। যদিও চোখে দেখেনি সে রূপবান পুরুষ কে, তবুও কিসের যেন আকর্ষণ! কি যেন টান!

স্বয়ংবরের দিনটি এগিয়ে এল। ক্রমে ক্রমে রাজারা এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। নলের কানেও পৌঁছল সে সংবাদ। তিনিও যাত্রা করলেন। দেবতাদের টনক গেল নড়ে। তাঁরাও যাত্রা করলেন দময়ন্তীর পাণীপ্রার্থী হয়ে। যেতে যেতে দেখা হয়ে গেল নলের সঙ্গে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও কলির। দেবতারা মনে মনে ঠিক করলেন নলকে পাঠাবেন দময়ন্তীর কাছে দূত রূপে। সম্মত হলেন নল। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন দময়ন্তীকে। দেখবেন তার নিষ্ঠা ও প্রেমের যথার্থ রূপটি।

দেবতাদের আশীষপূত নলরাজ বিবাহপ্রার্থী হয়ে চললেন দময়ন্তীর সমীপে। তাঁর গতি হল অলক্ষ্য।

স্বয়ংবরের দিনটি হল সমুপস্থিত। লোকের কৌতুহলের অন্ত নেই। নানা রং-এর বেশ ভূষায় ভূষিত হয়েছে দময়ন্তী। স্বয়ংবর সভায় যাবে সে। তাকে দেখে পছন্দ নয়, দময়ন্তী নিজেই বেছে নেবে তার বরকে। পরিয়ে দেবে তাঁর গলায় বরমাল্য।

আপন শয়ন কক্ষে অপেক্ষমান দময়ন্তী। আর কিছু সময়ের মধ্যেই গিয়ে হাজির হবে সভায়। সহসা কি হল! চমকে উঠল দময়ন্ত। তার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হল এক দিব্য পুরুষ। বিস্ময়ে হতবাক দময়ন্তী। তাকিয়ে রইল সেই স্নিগ্ধ সুঠাম যুবকের মুখের পানে। ক্ষণ বিরতি। বলে উঠলেন যুবকটি—'ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা চান তোমার পানি গ্রহণ করতে। আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদের দূত হিসেবে। তোমার মনগত ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাধিত হব।'

দময়ন্তী নীরবে শ্রবণ করল তাঁর কথা। তার পরে প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল—'হে দূত, দেবতারা আমার স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁদের চরণে আমার প্রণাম নিবেদন করে বলবেন, মনে মনে আমি অনেক পূর্ব থেকেই একজনকে বরণ করে বসে আছি। দেবতা অথবা অপর কাউকে এখন বরণ করলে আমি যে সতী ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব। ধর্মকে রক্ষা করে চলেছেন দেবতারা। তাঁরা যেন আমাকে আমার অভীষ্ট বর লাভে আশীর্বাদ করেন।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন দূত—'তবে আপনার সে বরণীয় পুরুষটি কোন ভাগ্যবান?'

অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল দময়ন্তী—'নিষধরাজ নল ই আমার সেই প্রত্যাশিত অন্তর-সুন্দর!'

—আমিই সেই নিষধরাজ। আমার নাম নল!

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেবদূত। বিস্ময়-বিমূঢ় দময়ন্তী নির্বাক স্থাণুর মত বসে রইল।

স্বয়ংবর সভা বসেছে। রাজা মহারাজা সব উপস্থিত। কোন জনের অন্তরালে নল লুকিয়ে কে তা জানে।

অন্তর খুঁজে নেয় তার অন্তর পুরুষকে। তাঁকে পেতে চর্ম চোখের দরকার হয় না। অন্তঃদৃষ্টিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাঁর কাছে। করে দেয় বক্ষলগ্ন। এক্ষেত্রেও হল তাই।

সভাকক্ষে অনেক রাজা। অনেক লোক। নলরূপে চারজন

উপস্থিত। দময়ন্তী চলেছে একের পর এক রাজাকে অতিক্রম করে। হাতে তার বরমাল্য। অন্তরে সেই প্রেম-প্রতিমূর্তি। অবশেষে উপস্থিত হল এসে যথাস্থানে। কিন্তু একি! এ যে চার মূর্তি। এবং সকলেই একরূপ। এক কান্তি। একই সেই নল।

থমকে দাঁড়াল দময়ন্তী। নয়ন মুদে আবার দেখে নিল তার অন্তরে লালিত সেই রূপটি। তাকাল প্রসন্ন নয়নে। তার পরে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করল তার প্রার্থনা। এ যে দেবতাদেরই ছলনা। তারাই নলের রূপ ধরে সম্মুখে উপবিষ্ট। কার কণ্ঠে পরাবে সে মালা?

দময়ন্তীর কণ্ঠে অরুন্তুদ আর্তি—'হে দেবতাগণ। আমার সতী-ধর্ম রক্ষা করতে আপনারা সহায় হোন।'

সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীর ভ্রম কেটে গেল। প্রকৃত নল প্রভাস্বর হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। বাকী তিন জনের চরণ যুগল স্পর্শ করল না ভূমি। দময়ন্তী ভাল করে দেখে নিল সেই মর্তের মানুষটিকে। পরিয়ে দিল কণ্ঠে বরমাল্য। বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। দময়ন্তীর নিষ্ঠা তাকে প্রতিষ্ঠিত করল অভীষ্ট জনের বক্ষে। মালা দান করবার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ও দান করে দিল নিষধরাজ নলকে। খুশীর জোয়ার বইল। সতীর বহু দিনের প্রতীক্ষা—প্রাণের মানুষটিকে খুঁজে নিতে হ'ল সক্ষম।

শুদ্ধ মন সত্যের প্রতিবিম্ব। তার চেতন-দর্পণে প্রকৃত নলের প্রতিমূর্তি তাই সহজ হয়ে ধরা দিল। নারী তার নিষ্ঠা ও প্রেমের স্পর্শে আপনজনকে একান্ত নিজের করে নিল।

বেশ সুখ ও শান্তিতে কাটতে লাগল নবদম্পতির জীবন। যৌবনের ভরা গাঙ্গে দুটি মানুষ প্রাণে প্রেমে মিশে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু এ সুখের নিশি একদা ভোর হল। দেখা দিল দুঃখের যাতনা। অভাব নেই। অনটন নেই। কিন্তু সংসারটায় দেখা দিল মনের দৈন্য। নলের ছোট ভাই পুষ্কর সহ্য করতে

পারল না দাদার এই সুখ শান্তি। নানা ছলে দাদাকে আবদ্ধ করে রাজ্যচ্যুত করতে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব? নানা ভাবনার জাল বুনে অবশেষে বেছে নিল অক্ষক্রীড়ার পথটি। এই একমাত্র উপায়, যা দ্বারা পুষ্কর পরাভূত করতে সক্ষম হবে তার সহোদর ভাইকে। এ খেলাটিতে নলের ও খুব আসক্তি। কিন্তু পুষ্কর তাঁর তুলনায় বিশেষ পারদর্শী।

পুষ্করের সঙ্গে পণে আবদ্ধ হয়ে অক্ষক্রীড়ায় অবতীর্ণ হলেন নল। বারে বারে যেতে লাগলেন হেরে। ফল স্বরূপ হারালেন রাজ্য। ধন দৌলত যা কিছু সব। রাজ-মর্জির পরিণাম বড় ভয়াভহ। জেদের বসে নল সর্বস্ব পণ করে অবশেষে নিষধ রাজ্য থেকে হলেন বিতাড়িত। সে দিনের প্রতাপ প্রবল রাজা নল, খেলাতে হেরে গিয়ে আজ এসে দাঁড়ালেন পথের ভিখারী হয়ে।

হাহাকার। হতাশা। অভিশাপের মত নেমে এল নলের জীবনে। পথ অন্ধকার। আশ্রয়হীন। দাঁড়াবার মত একটু মাটিও নেই তাঁর অধিকারে। কোথায় যাবেন তিনি? মানুষের কাছে কেমন করে দেখাবেন মুখ। গহন ঘন অরণ্যের আবাস ছাড়া আর কোথাও মিলবেনা তাঁর ঠাঁই। তাই বন গমনে উদ্ধত হলেন নল। দময়ন্তী হলেন তাঁর দুঃখের সঙ্গিনী।

রাজপ্রাসাদ শূন্য হল। রাজ্য পড়ে রইল। ঐশ্বর্যের অমরা থেকে অন্তঃহীন দুঃখের পথে প্রিয়ার হাত ধরে যাত্রা করলেন নল। যেতে যেতে বললেন দময়ন্তীর পানে তাকিয়ে,—'আমিই হলেম তোমার সকল দুঃখ কষ্টের কারণ-প্রিয়ে। কেন তুমি আমার অনুবর্তিনী হয়ে এতটা কষ্ট ভোগ করছ?'

মায়া মাখা দুটি হরিণ আঁখি তুলে বললেন দময়ন্তী, 'সুখে আমি তোমার সঙ্গিনী, দুঃখে কি আমি তোমার নই? তোমার সুখ দুঃখই যে আমার হাসি কান্না। তুমি যেখানে থাকবে, আমার বসতি ও হবে

সেখানে। সেখানেই হবে আমার স্বর্গবাস। আমার জন্য আমি ভাবিনা। আমার দিবস শর্বরীর চিন্তা তোমাকে নিয়ে।

কিছু নেই। কেউ নেই। আছে শুধু হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস। এক বস্ত্র পরিধানে। এক কান্না দুজনার অন্তরে। তাই মন্থরগতি। অনেকটা পথ হেটে এসে উপস্থিত হলেন বনে।

দিন যায়। রাত আসে। পাখী ডাকে। বনের মর্মরে হাওয়ার নিস্বন। এ যেন ওদের পাজরনিংড়ান হাহাকার। এত কষ্ট, এত দুঃখ তবুও তার মাঝে জীবন আহরণের বাসনা ক্ষণে ক্ষণে পেছনের দিন গুলোকে ভুলিয়ে দিতে চায়।

সেদিন বনের মধ্যে নল দেখতে পেলেন এক সোনালী পাখী। বড় ভালো লাগল। ছুটলেন তার পেছন পেছন। উদ্যত হলেন তাকে ধরতে। ফলে হল কি? অঙ্গের বসন গেল হারিয়ে। অর্ধাঙ্গিনী দময়ন্তী এলো এগিয়ে। তার কাপড়ের অর্ধেকটা ছিঁড়ে পরিয়ে দিল স্বামীকে।

দময়ন্তীর মনে নিরন্তর একটা প্রশ্নই বারে বারে আবর্তিত হয়। একটা প্রশ্ন তাকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তোলে। কি সে প্রশ্ন? —এ দুঃখের রাত্রির কি অবসান হবে না?

সতীর মনে প্রশ্ন। এ তো কম কথা নয়। ও যে শক্তির আধার। তাই তো বিপদ মুক্তির একটা পথের দেখা পাওয়া গেল।

তখন অযোধ্যার রাজা ছিলেন ঋতুপর্ণ। অক্ষক্রীড়ায় তিনি অদ্বিতীয়। নল যাবেন তার কাছে। শিখবেন পাশাখেলা। হবেন পারদর্শী। তারপরে পুষ্করকে পরাভূত করে ফিরিয়ে আনবেন তাঁর হৃত রাজ্য। কিন্তু এই মলিন ছিন্ন বেশ বাস নিয়ে একা তিনি যেতে পারলেও দময়ন্তীকে সঙ্গে নেওয়া চলেনা। তাই বললেন স্ত্রীকে—তুমি গিয়ে কিছু দিন পিতৃগৃহে থাক।

দময়ন্তী এ প্রস্তাবে হলেন না সম্মত। কারণ দুঃখের দিনে পরিজনের

কাছে যাওয়াটা তাঁর কাছে একটুও ভাল লাগল না। তাই সরাসরি বললেন দময়ন্তী—তুমি আমাকে এ আদেশ ক'রনা।

নল ভাবলেন দময়ন্তীর জ্ঞাতে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রশ্ন তো ওঠেই না। এখন উপায়? উপায় ভগবান। সেই অদৃশ্য শক্তির হাতে দময়ন্তীর সব ভার ন্যস্ত করে অশ্রুস্তিমিত নয়নে বনত্যাগ করলেন। একা পড়ে রইলেন দময়ন্তী। নিদ্রা ভঙ্গে দেখলেন স্বামী নেই কাছে। পাগলিনী দময়ন্তী বন-বন্ধুর দুর্গম দিগন্তে ঘুরলেন। অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু হায়, কোন সন্ধান মিলল না। এবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল অজস্র ক্রন্দন রোল। বিলাপের সুরে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন দময়ন্তী—ওরে ও অলস নিদ্রা। কেন তুই আমার চোখে এনেছিলি জড়িমা? কেন তুই আমাকে ধরে রাখলি অচেতনের কোলে? নিদ্রাই হল আমার কাল।

বিপদের উপর আসে বিপদ। স্বামীহারা দময়ন্তী মনের দিক থেকে একেবারেই পড়লেন ভেঙ্গে। একে একে সব আলোর প্রদীপ গুলো নিভে গেল। উদ্‌ভ্রান্ত দময়ন্তী সহসা পড়লেন একদিন অজগর সর্পের মুখে। ভয়ে ভীতা দময়ন্তী প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলেন আপ্রাণ। কিন্তু সর্পও পিছু পিছু ছুটছে। অবশেষে কোথা থেকে যেন একটি তীর এসে বিদ্ধ করল সর্পটিকে। সঙ্গে সঙ্গে গেল তার প্রাণ বেরিয়ে। রক্ষা পেলেন দময়ন্তী মৃত্যুর হাত থেকে। হতচকিত দময়ন্তী এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। দেখলেন এক বেদে তাঁর জীবন রক্ষার্থে এ কাজ করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন দময়ন্তী। কিন্তু বেদে ওটুকুন পেয়েই খুশী হতে পারল না। আসঙ্গাতুর বেদে দময়ন্তী প্রতি কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। নিরুপায় নারী! তাঁর সতীত্বই একমাত্র সম্বল। তাই তিরস্কারে জর্জরিত করলেন বেদেকে। এবং পরিত্যাগ করলেন সেই স্থান।

পাগলের মত দময়ন্তী ঘুরতে লাগলেন ছিন্ন বসনে। দেহ ক্লান্ত।

শীর্ণ শরীর। মন অবসন্ন। ঘুরতে ঘুরতে এসে উপনীত হলেন চেদী রাজ্যের মধ্যে। একদা উন্মনা দময়ন্তী হাটছিলেন রাজপথে। রাজ প্রাসাদ থেকে দেখা যাচ্ছিল তাঁকে। রাজমাতার দৃষ্টি পড়ল। করুণার উদ্রেক হল তাঁর অন্তরে। দাসী পাঠিয়ে ডেকে আনলেন তাঁকে। শুধালেন পরিচয়। দময়ন্তী তাঁর জীবনের দুঃখের অধ্যায়ের সব পাতা-গুলো ধরলেন খুলে। সব শুনলেন রাজমাতা নীরবে। বেদনায় তাঁর চোখেও এল জল। তিনি রেখে দিলেন তাঁকে রাজ প্রাসাদে। অন্বেষণ করতে লাগলেন নলের।

কোথায় নল। কোথায় দময়ন্তীর প্রাণবন্ধু। কোন গহন ঘন অরণ্যের অন্ধকারে কাটছে তাঁর দিন? কত দুঃখ, দৈন্য, নির্যাতন না সহ্য করছেন তিনি।

রাজ অন্তঃপুরে থেকেও দময়ন্তীর চোখে ঘুম নেই। শুধু ভাবেন আর ভাবেন। স্বামীর চিন্তায় তন্ময় দময়ন্তী।

এ দিকে নল একদা পথে যেতে যেতে দেখতে পেলেন একটি অর্ধ মৃত সর্প। দাবানলে দগ্ধ প্রায় প্রকাণ্ড সর্পটি শক্তিহীন। দুর্বল। দয়ার উদ্রেক হল নলের অন্তরে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আগুনের মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনলেন সর্পটিকে। রক্ষা করলেন তার প্রাণ। কিন্তু হিংস্র জন্তুর স্বভাব থেকে সে কেন হবে বিচ্যুত? সর্পটি অবশেষে জীবন ফিরে পেল বটে, কিন্তু দংশন করল তার জীবন রক্ষক নলকে। বিষে ছেয়ে গেল নলের সমস্ত শরীর। সোনার অঙ্গ গেল কালো হয়ে। ব্রণে ভরে গেল সমস্ত মুখ মণ্ডল। সেই সুন্দর নল পরিচিত লোকদের কাছে হয়ে গেল অপরিচিত। নল মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজে নিলেন। ভাবলেন—এই দুঃখের দিনে এমন কুৎসিত রূপই তো ভাল। এ আমার ছদ্মবেশের উপযুক্ত আভরণ।

অশ্ববিদ্যায় নল চিরদিনই পারদর্শী ছিলেন। একদা তিনি এসে উপস্থিত হলেন অযোধ্যায়। সারথ্য বরণ করলেন ঋতুপর্ণের। নল নামের পরিবর্তন হল। ঋতুপর্ণের সারথী নলের নাম হল বাহুক।

বাহুকের দক্ষতা ও সুমধুর ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হলেন ঋতুপর্ণ। বেশ কাটতে লাগল তার দিনগুলো।

এদিকে দময়ন্তীর পিতা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর কানে পৌঁছল জামাতা ও কন্যার দুঃখের কাহিনী। তিনি অধীর। ব্যাকুল হয়ে লোক পাঠালেন চতুর্দিকে নল ও দময়ন্তীর খোঁজে। বন থেকে বনান্তর, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে দূতগণ এসে উপস্থিত হল চেদী রাজ্যে। সন্ধান মিলল দময়ন্তীর। দূতগণ তাঁকে নিয়ে গেল বিদর্ভরাজ্যে। কিন্তু নল? নল কোথায়।

পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন দময়ন্তী। মনে শান্তি নেই, সুখ নেই। অন্তর করে আতিবিথি। নল ছাড়া দময়ন্তী অস্তাচলগামী সূর্যের মত নিষ্প্রভ। নিষ্প্রাণ। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কখনো বা নির্বাক স্থানুর মত বসে থাকেন। কন্যার দুঃখ বিদর্ভরাজকে অস্থির করে তোলে। তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই। নলের খোঁজে তিনি ইতিমধ্যেই প্রেরণ করেছেন দূতগণকে।

অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হল এক দূত। দেখা পেল বাহুকের। ঋতুপর্ণের সারথী বেশে এ কে? প্রশ্নের প্রভঞ্জনে দূত চিন্তাক্লিষ্ট। বহুভাবে পর্যবেক্ষণ করল। রূপের সঙ্গে কোন মিল না থাকলেও গুণে ঠিক নলেরই অনুরূপ। তবে কি, তবে কি নলই ছদ্মবেশে সারথী!

অবশেষে দূত চলে এল দময়ন্তীর সমীপে। নিবেদন করল সকল সংবাদ। সন্দেহ হল দময়ন্তীর। তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। এক দূতকে পত্র দিয়ে পাঠালেন ঋতুপর্ণের কাছে। লিখলেন দময়ন্তী —নলের কোনো সন্ধান নেই। সুতরাং দময়ন্তী উপস্থিত হচ্ছে দ্বিতীয় স্বয়ংবর সভায়!

সংবাদটি শ্রবণ করে ঋতুপর্ণের পুরুষ চেতনাটা চনমনে হয়ে উঠল। তিনি দময়ন্তীর রূপ যৌবন ও গুণ সম্বন্ধে বহু কাহিনী শুনেছেন। এমন একটি নারী যে কোন পুরুষের বাঞ্ছিত। সুতরাং তিনি বিদর্ভে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু নল তাঁর প্রত্যয়ে দৃঢ়। এ কিছুতেই সম্ভব নয়। নলের অন্তর এতটুকুও বিচলিত হল না। তিনি নির্বিধায় ঋতুপর্ণের সারথী হয়ে উপস্থিত হলেন এসে বিদর্ভে।

দারিদ্র নলের রূপকে দিয়েছে ঢেকে। যৌবনকে করেছে ম্লান। কিন্তু তাঁর আচার আচরণ, কথাবার্তা যেমন ছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। তাইতো সন্দেহের উদ্রেক হল ঋতুপর্ণের সারথি বাহুক সম্বন্ধে দময়ন্তীর মনে। গোপনে তিনি ডাকিয়ে নিলেন বাহুক কে। তুজনে হল মুখোমুখি। চোখে চোখ পড়তেই তুজনার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল। উভয় উভয়কে চিনতে পারলেন। অশ্রুতে আপ্লুত হল নয়ণ। বহুদিনের অদর্শনের বেদনা তুজনকে আরো গভীর আরো নিবিড় করে প্রেমের বাঁধনে বাঁধল।

নল ও দময়ন্তী যাত্রা করলেন নিজেদের রাজ্যে। আহ্বান করলেন পুস্করকে পাশাখেলায়। অক্ষক্রীড়ার সমস্ত কৌশল তিনি জেনে নিয়েছেন ঋতুপর্ণের কাছ থেকে। তাই সহজেই পরাজিত করে দিলেন পুস্করকে। উদ্ধার হল তাঁর হৃত রাজ্য। তুঃখের তুয়ার ভেঙ্গে নেমে এল আলোর প্লাবন। নল ও দময়ন্তীর প্রেম-প্রভা প্রভাস্বর হয়ে উঠল। প্রজারা ফিরে পেল এত দিন পরে তাদের আপন জনকে। সতীত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল নল দময়ন্তীর জীবন ও যৌবন। সার্থক প্রেম উভয়কে করে তুলল মহিমময়।

॥ দ্রৌপদী ॥

স্মৃতিময় অতীত।

তার পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে কত কাহিনী। কত ইতিহাস। কত যুগের পতন হয় উত্থান হয়। কত জীবন জ্বলে ওঠে। আবার হারিয়ে যায় কালের নিরন্ধ্র অন্ধকারে। দিন বদলায়। অতিক্রান্ত হয় সেযুগ। জীবন নিভে যায়। কিন্তু কাহিনীর গতি সপিল হলেও মরেনা। স্মৃতি হয়ে রয়ে যায় যুগ যুগান্ত। তা থেকেই আমরা আহরণ করি বীর গাঁথা, পুণ্য গাঁথা। আহরণ করি বেদনায় কাহিনী। কান্নার ইতিহাস।

পাঞ্চাল দেশের কথা বলছি।

রাজার নাম ছিল দ্রুপদ। রাজ কন্যার নাম ছিল দ্রৌপদী। আরো কয়েকটা নাম ছিল তাঁর। পাঞ্চালী, কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী। বহুনামে পরিচিতা এই নারীর জীবন ছিল অপূর্ব তাই আজো স্মরণীয়া।

রাজা দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের এককালে ছিল প্রগাঢ় সখ্যতা। বিরম্বিত ভাগ্য নিয়ে একদিন তিনি এসে উপস্থিত হলেন বন্ধু-প্রীতিপ্রার্থী হয়ে দ্রুপদের কাছে।

দ্রুপদ রাজা। শৌর্যে বীর্যে গর্বিত দ্রুপদ যেন চিনতে পারলেন না বন্ধু দ্রোণাচার্যকে। উপেক্ষা, অপমান ও অসম্মানে ম্লান করে দিলেন দ্রোণকে। অপমানিত করলেন তিনি এককালের বন্ধুকে ভিখারী ব্রাহ্মণ বলে।

ব্যথা পেলেন দ্রোণ আত্মদহনের নীরব অগ্নি তাঁর অন্তরকে করল ভস্মিভূত। ভুলতে পারলেন না তিনি এ জ্বালার দহন। ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। গ্রহণ করলেন পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্র শিক্ষার দায়িত্ব।

সু-শিক্ষিত করে তুললেন তাঁদের অস্ত্রবিদ্যায়। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের শিক্ষা তাঁদের করে তুলল পারদর্শী।

প্রতি হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দ্রোণের অন্তরে। অর্জুনের দ্বারা পরাভূত করলেন দ্রুপদকে। নিয়ে এলেন বন্দী করে। পূর্বের অসম্মানের প্রতিশোধ নিলেন যথারীতি। ছেড়ে দিলেন তার পরে।

হিংসা হিংসার ইন্ধন যোগাল। বিষাক্ত হয়ে গেল দ্রুপদের মন। প্রতিশোধের বজ্র-শপথে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। দ্রোণের বিনাশ চিন্তায় খসে পড়ল রাতের ঘুম চোখের পাতা থেকে। অবশেষে শুরু করলেন এক যজ্ঞ। দ্রোণকে বধ করতেই হবে। শুধু দ্রুপদের নয়, এ অপমান তামাম পাঞ্চাল দেশের।

মহাসমারোহে জ্বলে উঠল যজ্ঞাগ্নি। এই যজ্ঞাগ্নির মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবে এক সুদর্শন কুমার। যিনি বধ করবেন দ্রোণকে।

নিষ্ঠার অন্ত নেই দ্রুপদের। চেষ্টার বিরতি নেই বিন্দু। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ আহুতি দিলেন যজ্ঞে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি থেকে উত্থিত হল এক কুমার। তাঁর মস্তকে শোভাময় হয়ে রয়েছে ধর্মমুকুট। একহাতে শানিত খড়্গ। আর একহাতে ধনুর্বাণ। এই অপূর্ব কুমারকে দর্শন করে পাঞ্চালগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বারে বারে করতে লাগল জয় ধ্বনি। দ্রুপদের অন্তরে গর্জন করে উঠল তৃপ্তির সুধা সমুদ্র। প্রতি হিংসা গ্রহণের প্রকৃষ্ট মনটা গেল প্রশস্ত হয়ে। দৈববানী শুনতে পেলেন দ্রুপদ—এই কুমারই করবে দ্রোণকে নিধন। এবং দূর করবে তোমার মনের গ্লানি।

শুধু কি তাই ?

কুমারের আবির্ভাবের কিছুক্ষণ পরে যজ্ঞ বেদী থেকে উত্থিত হল এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা। আয়ত আঁখি। ভ্রমর কালো কুঞ্চিত কেশ। নীলোৎপল আভা অঙ্গ। পীন ঘন স্তন। আদিগন্তে দ্যুতিচ্ছটা বিকিরিত

হয়ে পড়ল। অসবাবর্ণিনী বটে, কিন্তু জ্যোতি তার নিষ্কলঙ্ক ইন্দু সদৃশ। অঙ্গে তাঁর দেববাঞ্ছিত অপূর্ব সৌরভ।

বিস্ফারিত আঁখি পাতে প্রত্যক্ষ করতে লাগল সমাগত দর্শকবৃন্দ। বিস্ময়ে তাঁরা হতবাক। দ্রুপদ রাজার আনন্দের সীমা নেই। এই দুর্বাদল শ্যামাঙ্গী কন্যার নাম রাখা হল কৃষ্ণা।

আবার দৈববানী ধ্বনিত হল—এই নারী দ্বারা ক্ষত্রিয় ও কুরুকুলের নিধন সাধিত হবে!

যজ্ঞ থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণাকে লাভ করে দ্রুপদ পরম প্রীত হলেন!

পিতার স্নেহ যত্ন ও লালন রক্ষণে বর্ধিতা হতে লাগলেন কৃষ্ণা। তাঁর জীবনে এল যৌবনের বান। দেহের প্রতিটি পাপড়িতে পাপড়িতে চেতনার সৌগন্ধ। এমন কন্যার কণ্ঠে কে পরাবে বরমাল্য। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না দ্রুপদ। চিন্তাক্লিষ্ট রাজা। অবশেষে আয়োজন করলেন স্বয়ংবর সভাব। ঘোষিত হল সে সংবাদ। বহু দূর দূর থেকে এলো সব রাজা মহারাজারদল! পাণ্ডবেরা ছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাঞ্চাল দেশে। কৌতুক নিবারণে অক্ষম হয়ে তাঁরাও এসে উপস্থিত হলেন সভায়। দ্রৌপদীর রূপ দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল নৃপতিদের মধ্যে। ছুটে গেল সবাই লক্ষ্যভেদ স্থলে।

কিন্তু এ কি ধরণের স্বয়ংবর সভা?

ঊর্ধে রাখা হয়েছে একটি মৎস্য। মৎস্যের চোখের নিম্নভাগে রয়েছে একটি ঘূর্ণায়মান চক্র। জলের পাত্রটি রয়েছে নীচে। তারই মধ্যে প্রতিবিম্বিত ঐ মৎস্য। যে ব্যক্তি ঐ জলাধারের পানে তাকিয়ে বিদ্ধ করতে পারবেন মৎস্য-চক্ষু, তিনিই লাভ করবেন কৃষ্ণাকে স্ত্রী রূপে।

এ বড় দুঃসাধ্য কাজ। তাই একে একে সকলেই হলেন ব্যর্থকাম। আশাভঙ্গের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে তাঁরা ফেললেন দীর্ঘশ্বাস। দৌপদীর রূপ তাঁদের অন্তর হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু সাফল্যের দিগন্তে শুধু ব্যর্থতার মরুমূর্ছা। এবারে এলেন দুর্যোধন। না। তিনিও পারলেন না। শল্য, তাঁরও একই হাল হল। কর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন

লক্ষ্য ভেদ করতে। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্তা কৃষ্ণা করলেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান। সারথিপুত্র কর্ণের কণ্ঠে পরাবেন না তিনি বরমাল্য। বিরত হলেন কর্ণ। বসে পড়লেন বিষণ্ণবদনে।

এবারে এগিয়ে এলেন সহজ সরল সাজসজ্জাহীন সাধারণ এক ব্রাহ্মণ। এদ্দিন জীবন কেটেছে অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু কৌতুক বসত স্বয়ংবর সভা দর্শন করতে এসে মনে উৎসাহের উদয় হল। পুরুষোচিত পদক্ষেপ। দৃঢ়বদ্ধ বাহু। দ্রৌপদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন তিনি। কি নাম তাঁর? অর্জুন। ক্লেশহীন, ক্লান্তিহীন অনায়াস লক্ষ্য ভেদ সাধিত হল তাঁরদ্বারা। জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল সভাস্থল। ঈর্ষার উদ্রেকও কিছু কম হল না। কারণ উপস্থিত দর্শকবৃন্দ প্রথমটায় উপহাসই করছিলেন। কিন্তু কার্য সমাধার পরে তারা হতবাক নীরব দর্শক বৈ আর কিছুই নন।

কিন্তু দ্রৌপদী জানলেন না, কার কণ্ঠে পরালেন মালা।

স্বয়ংবর সভা ভাঙ্গল। পঞ্চভ্রাতা মনের আনন্দে ঘরে ফিরলেন দ্রৌপদীকে নিয়ে।

যুধিষ্ঠির বাইরে থেকে এ শুভ সংবাদ নিবেদন করলেন মাকে— দেখ মা, কি অপূর্ব সুন্দর জিনিস নিয়ে ফিরে এসেছি।

কুন্তী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন— যা এনেছ বাবা, তোমরা পাঁচ জনে ভাগ করে নাও।

কিছু জানতেন না কুন্তী। কি এনেছে, কাকে এনেছে, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন তিনি। কাজেই দ্রৌপদীকে দর্শন করে হতবাক্ হয়ে গেলেন কুন্তী। পড়লেন চিন্তিত হয়ে। কুন্তীর কণ্ঠে আড়ষ্ট জিজ্ঞাসা— আমি না জেনে এমন কথা বলেছি যুধিষ্ঠির। এখন উপায়?

যুধিষ্ঠির বললেন— তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য মা। আমরা পাঁচ ভাই মিলেই বিয়ে করব এ কন্যাকে।

কিন্তু দ্রৌপদীর জনক দ্রুপদ বললেন— তা কি করে সম্ভব? এ যে বেদ-বিরোধী বাণী। এক পুরুষ গ্রহণ করতে পারেন বহু স্ত্রী। কিন্তু

এক নারী কি করে বহু বল্লভা হবে! তা হয়না যুধিষ্ঠির। তুমি ভাই-দের মধ্যে বড়, তুমি ছাড়া অন্যের বিয়ে সম্ভব নয়। সুতরাং তুমিই গ্রহণ কর আমার কন্যাকে। যদি একান্তই তুমি তা না করতে চাও, তবে তোমার মনোনিত প্রার্থীর নাম বল।

রাজা দ্রুপদ মহাচিন্তাচ্ছন্ন অন্তরে যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন ঠিক তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ব্যাসদেব। সব কথা দ্রুপদ খুলে বললেন তাঁকে। দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পিতার মতে এক মত হয়ে ব্যাসদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর মতামত।

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠিরের মুখে কখনো অ-ধর্ম কথন উচ্চারিত হয় না। তার বাক্যই সনাতন ধর্ম। তার কথাই এখানে নিয়ম অন্যের বেলা না হলেও এদের বেলা এই ব্যতিক্রমকেই মেনে নিতে হবে তোমাদের। এই বলে দ্রুপদরাজার সম্মুখে ব্যাসদেব তুলে ধরলেন অতীতের উপাখ্যান ঃ—

তিন জন্ম পূর্বে দ্রৌপদী যক্ষের এক নন্দিনী রূপে স্বামী লাভের প্রত্যাশায় কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন হিমালয়ের অঙ্কে। তখন তাঁর নাম ছিল কেতকী। ধ্যানাসনে একটি জন্ম গেল অতিক্রান্ত হয়ে। সহসা সেখানে এসে একদিন উপস্থিত হল এক সুরভী। তার পেছনে পাঁচটি ষণ্ড কামাসক্ত হয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটছে। ছুটাছুটিই নয় শুধু, এক সময়ে ষণ্ডে ষণ্ডে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। তাদের গর্জন ভেঙ্গে দিল কেতকীর ধ্যান। পঞ্চষণ্ড এক সুরভীর পশ্চাতে ধাবমান দর্শন করে কেতকী ঈষৎ হেসে ফেললেন। সুরভীর দৃষ্টি গোচর হল তা। ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল সে। এ উপহাসের হাসি তাকে আঘাত করল নির্মম ভাবে। গোমাতা অভিশাপ দিল কেতকীকে—

'নাহিক ইহাতে লজ্জা গরুজাতি আমি।
নরযোনি হয়ে তোর হবে পঞ্চস্বামী॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হৈবে নরযোনী।
দুই জন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিনী॥

তৃতীয় জন্মেতে হৈবে স্বামী পঞ্চজন।
লক্ষ্মী অংশ পেয়ে হবে শাপ বিমোচন॥
একজন অংশ তারা হৈবে পঞ্চজন।
ভেদাভেদ নহিবেক হৈবে একমন॥'

কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হ'ল ফল ফলতে। দ্রৌপদীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন ধর্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। করলেন তাঁরা দ্রৌপদীর পাণি প্রার্থনা। দেবগণের এ জাতীয় ব্যবহার তাঁর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। মনে মনে রুষ্ট হলেন তিনি। প্রতিকার কল্পে গিয়ে হাজির হলেন শিব ও বিষ্ণুর সমীপে! বিষ্ণু দেবগণকে বললেন,—তোমরা দেবতা হয়েও আসক্ত হয়েছ নর-কন্যার প্রতি। সুতরাং মর্তে নররূপে জন্ম গ্রহণ করে একদিন ঐ কন্যাকে লাভ করতে হবে। আমিও তখন মর্তে অবতীর্ণ হব অধর্মের বিনাশ সাধন করে ধর্ম সংস্থাপন করতে।

বহু পতি লাভের ভীতিতে ঐ কন্যা গঙ্গার জলে অকালে দেন জীবন বিসর্জন প্রথম জন্মে।

দ্বিতীয় বারে এসে জন্মালেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। শুরু করলেন নিষ্ঠা ভরে শিবস্তুতি। সৎ স্বামী লাভের ইচ্ছা তাঁকে গভীর ভাবে তন্ময় করল। প্রত্যহ করেন শিবপূজা। পূজান্তে পতিং দেহি, বলে পাঁচবার করেন নমস্কার। পূজায় খুশী হলেন শিব। পূর্ণ করলেন তার মনোবাঞ্ছা। বললেন, 'তথাস্তু।' পঞ্চবারের প্রার্থনাই মঞ্জুর। মানে এবারেও তোমার লাভ হবে পঞ্চপতি!

আতকে উঠলেন কন্যা। এ তো তিনি চান নি।

তাঁর একান্ত মনের অভিপ্সা তো এ ছিল না! কাজেই দ্বিতীয় জন্মেও গঙ্গার স্মরণ নিতে হল তাঁকে। মৃত্যুর সঙ্গে করতে হল মিতালী।

তৃতীয় বারে এলেন কাশীর রাজকন্যা রূপে। দেখা হল সেই ইন্দ্র,

পবন, ধর্ম, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে। তাঁরা বললেন, 'আমাদের কাউকে বিয়ে কর তুমি।'

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? যার পানে তাকান তাঁকেই দেখেন একরূপ। সকলের আকার প্রকার ও কথাবার্তা একই। কার কণ্ঠে মালা দেবেন?

তখন তাঁরা বললেন, 'তবে আমরা সকলেই হব তোমার স্বামী।'

আত্মগ্লানির দুঃসহ পীড়া সইতে না পেরে এবারেও রাজকন্যাকে গঙ্গার কোলে চির দিনের মত আশ্রয় নিতে হল।

তিনটি জন্ম অতিক্রান্ত হয়ে গেল মর্মন্তুদ বেদনার্তির মধ্য দিয়ে। অভিশপ্ত জীবনের ঋণ শোধ করলেন ব্যর্থ কান্নার জীবনের বিনিময়ে বারে বারে। তবুও প্রাক্তন খণ্ডে গেল না। চতুর্থ জন্মে এসে যজ্ঞাগ্নি থেকে কৃষ্ণারূপে আবির্ভূতা হলেন পাঞ্চাল দেশে দ্রুপদের ঘরে।

দ্রৌপদীর বিয়ে হয়ে গেল মহা সমারোহের মধ্যে। এবারেও পঞ্চপাণ্ডবকেই গ্রহণ করতে হল তাঁকে। শাশুড়ীরূপে পেলেন কুন্তীকে। প্রাক্তনের ফল এড়াতে পারলেন না দ্রৌপদী। পাণ্ডবকুলের পুত্র বধূ হলেন তিনি।

দ্বাপর যুগে হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। নাম তাঁর বিচিত্রবীর্য। ছিল তাঁর দুই পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। অন্ধ ছিলেন বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র। তাই কনিষ্ঠ পাণ্ডুকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল রাজ্য ভার। ধৃতরাষ্ট্র বিয়ে করেছিলেন গান্ধারীকে। গান্ধারীর গর্ভে অন্ধ রাজের ঔরসে জন্মেছিল শতপুত্র। দুর্যোধন এবং দুঃশাসন তাঁদের অন্যতম। এরা খ্যাত ছিলেন কৌরব নামে। পাণ্ডুমহিষী কুন্তীর গর্ভে জন্মালেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন। মাদ্রীর গর্ভে জন্মালেন নকুল ও সহদেব। এরা প্রখ্যাত ছিলেন পাণ্ডব নামে। এই পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠেই দ্রৌপদী পরিয়ে দিয়েছেন বরমাল্য।

হস্তিনাপুরে পৌঁছে গেল সংবাদ। ধৃতরাষ্ট্র খুব একটা খুশী হতে

পারলেন না। তবুও ভীষ্ম ও দ্রোণাদির পরামর্শে প্রচুর ধন রত্ন দিয়ে পাণ্ডবদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য পাঠালেন বিদুরকে।

দ্রৌপদী এলেন। এলেন পঞ্চস্বামী পরিবেষ্টিতা হয়ে শ্বশুরালয়ে হস্তিনাপুরে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবহার মুগ্ধ করল সকলকে। প্রিয়ভাষিণী লক্ষ্মীরূপিনী দ্রৌপদী তাঁর শ্রী ও কর্তব্য কর্মদ্বারা সহজেই জয় করতে সক্ষম হলেন শ্বশুর শাশুড়ীর মন। পরম সুখের সংসার। নির্বিরোধ জীবন। নুতন সংসার হলেও দ্রৌপদী যেন অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। সর্বগুণের আধার রূপ লাবণ্যময়ী সকলের সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন আপন ব্যক্তিত্ব। সুখে শান্তিতে কাটতে লাগল দিনগুলো।

ভবিষ্যতের ছায়া সঞ্চারিত হল ধৃতরাষ্ট্রের মনে। তিনি হস্তিনাপুরের অর্ধরাজ্য প্রদান করলেন পাণ্ডবদের। বিরাট প্রাসাদ তৈরী হল। পাণ্ডবগণ চলে এলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হল তাঁদের রাজধানী। এবারে দ্রৌপদীর হস্তে সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব হল অর্পিত। দ্রৌপদী হলেন রাজমহিষী।

নিখুঁত সম্রাজ্ঞী। সর্বত্রগামী হল তাঁর বুদ্ধিরচ্ছটা। তাছাড়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত প্রাণবান বিচক্ষণ প্রভু পেয়ে ইন্দ্র প্রস্থের জন ও জনতা হল উপকৃত। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, সকলের মুখে ফুটল তৃপ্তির হাসি। গৌরবে, গর্বে, সুরম্যহর্ম্যে ইন্দ্রপ্রস্থের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সকল রাজধানীকে ছাপিয়ে উঠল তার গরিমার গৌরব। পরম আনন্দে ও আনায়াসে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন পাণ্ডবগণ।

এত সব নাম ডাক শুনে একদিন দেবর্ষি নারদ এসে হলেন উপস্থিত। দ্রৌপদী ভক্তি বিনম্র হয়ে প্রণাম করলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। নারদ তাঁকে ভেতরে যেতে আজ্ঞা প্রদান করলেন। কাছে ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে। দিলেন এক পরামর্শ। বললে—তোমরা পাঁচ ভাই, স্ত্রী একজন। ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়ে

যাতে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য একটা ব্যবস্থা করে নিতে পার।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসু নয়নে তাকিয়ে রইলেন নারদের পানে। তিনি বলতে লাগলেন আবার—দ্রৌপদী একজনের গৃহে এক নাগাড়ে বাস করবেন একটি বছর। তখন যদি অন্য কোনো ভাই সে গৃহে তাঁদের একত্রে দর্শন করেন, তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বারোবছর কাটাতে হবে বনবাসে।

নারদের নির্দেশ মেনে নিলেন পঞ্চভ্রাতা এককবাক্যে বিনা দ্বিধায়।

কিন্তু অদৃষ্টের লিখনকে কে পারে মুছে ফেলতে। সে অঙ্গিকার ভাঙ্গতে হয়েছিল অর্জুনকে। লঙ্ঘন করতে হয়েছিল নিয়ম। বাধ্য হয়েই যেতে হল তাঁকে বারো বছরের বনবাসে। তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। দ্বারকায় হরণ করলেন শুভদ্রাকে। বিয়ে করলেন তাঁকে। কাটালেন সেখানে একটি বছর। বনবাস কাল শেষ হল। অর্জুন প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে।

এ অন্তর বিদারণ সংবাদ দ্রৌপদীকে করল প্রচণ্ড আঘাত। নীরবে মুছলেন তিনি আঁখি-ধার। অভিমানে এক সময়ে ফেটে পড়লেন অর্জুনের সম্মুখে—কেন, কেন তুমি ফিরে এসেছ আমার কাছে? যাও, ফিরে যাও তোমার সেই নবপরিণীতা সুভদ্রার সমীপে। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধ। সুখে দিন কাটাও। যে বাঁধন একবার নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলেছ, তাকে আর জোড়া লাগাবার ব্যর্থ প্রয়াস কেন কৌন্তেয়?

অর্জুন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, দ্রৌপদীর অন্তরে হয়েছে অভিমানের সঞ্চার। শুধু অভিমান কেন? ব্যথাও কম পায় নি। তাই বারে বারে অর্জুন নিজের কৃতকর্মের জন্য প্রার্থনা করলেন ক্ষমা। সান্ত্বনা দিতে লাগলেন আপন সহধর্মিনী বলে।

শুভদ্রা এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। গেলেন কুন্তীর কাছে। সেখান থেকে ধীর পদপাতে এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীর সম্মুখে। কুন্তী তাঁকে গ্রহণ করছেন। বরণ করে নিয়েছেন পুত্র বধূরূপে। মনে মনে

কুন্তী খুশীও কম হননি। তবুও তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। কারণ দ্রৌপদীর আশীর্বাদ বৈ এ সবই যে যাবে মিথ্যা হয়ে। তাই উৎকণ্ঠিত অন্তরে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন কুন্তী।

নম্রনতা সুভদ্রা দ্রৌপদীকে বললেন—দিদি, আমি তোমারই দাসী। আমাকে গ্রহণ কর।

বাত্যা-বিক্ষুব্ধ অন্তরে সঞ্চিত হল করুণার বারি। বুঝিবা আঁখি পল্লব সিক্ত হয়ে উঠল দ্রৌপদীর। দুটি আয়ত আঁখি তুলে তাকালেন তিনি। বললেন সুভদ্রাকে—কাছে এসো প্রিয়ম্বদ!

দুটি বাহু প্রসারিত করে দিলেন দ্রৌপদী। আবদ্ধ করলেন সুভদ্রাকে আবক্ষ আলিঙ্গনে—তোমার স্বামী যেন কোন দিন শত্রু-কবলিত না হন। আশীর্বাদ করছি, চির স্বামী-সোহাগিনী হও!

স্নেহাশক্ত দ্রৌপদী সুভদ্রাকে গ্রহণ করলেন কনিষ্ঠা ভগ্নির মত। দুটি বোনের মিলন-মাধুরী রাজভবনের অন্দরকে করে তুলল আরো মধুময়। আরো সুন্দর।

কিছু দিনের মধ্যেই ওঁরা হলেন পুত্রবতী। সুভদ্রার ছেলের নাম হল অভিমন্যু। আর দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি ছেলে হল। তাদের নাম রাখা হল যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতাসাম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

খুশীর জোয়ার এলো পাণ্ডবকুলে। আনন্দে, প্রাচুর্যে, প্রাণে, প্রেমে ইন্দ্রপ্রস্থের আকাশ বাতাস পবিত্র হয়ে উঠল। নারদের নির্দেশে যুধিষ্ঠির আয়োজন করলেন রাজসূয় যজ্ঞের। ভায়েরা অনুমতি দিলেন। অমাত্যেরা এলেন এগিয়ে। এ বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রয়েছে তাঁদের অন্তরের অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু কৃষ্ণ এসে বললেন—জরাসন্ধ জীবিত থাকতে এ যজ্ঞ আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না মহারাজ। তবে যদি আদেশ দেন, তাহলে এখুনি আমি ভীমও অর্জুনকে নিয়ে যাত্রা করতে পারি জরাসন্ধ বিজয়ে।

কৃষ্ণ-বাক্য অভ্রান্ত। তাই কৃষ্ণার্জুন ও ভীম রওনা হয়ে গেলেন

মগধে। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ হল। জরাসন্ধ হলেন মৃত্যু মুখে পতিত। পথের কণ্টক সরে গেল। এবারে পাণ্ডবগণ বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে; পাঁচ ভাই পাঁচদিকে গেলেন। সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হল পাণ্ডবদের কাছে। প্রচুর কর আদায় করলেন তাঁরা। ফিরে এলেন ভীমার্জুন দেশে।

বিজয় গর্বে গর্বিত পাণ্ডবরা এবারে যজ্ঞের আয়োজন করলেন দ্বিধা হীন হয়ে। অগ্রজ যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞের হোতা। সমস্ত রাজারা আমন্ত্রিত হলেন যজ্ঞে। এলেন যাজ্ঞবল্ক্য, ধৌম্য এবং স্বয়ং ব্যাসদেব। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্যোধনও এলেন। এলেন কর্ণ, শল্য, শকুনি। এলেন সোমদত্ত ও ভূরিশ্রবা. আরো কত অজস্র দর্শকের হল সমাগম।

করজোড়ে সকল রাজাদের অনুমতি নিলেন যুধিষ্ঠির। অনুমতি নিলেন গুরুজনদের। কাজ ভাগ করে দিলেন সকলকে। বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল যজ্ঞ। নিষ্ঠা নিয়মের বিন্দু ব্যতিক্রম হসনা। যথা বিধি হল যজ্ঞশেষ। কিন্তু কৃষ্ণ বাধ্য হয়েই যজ্ঞস্থলে বধ করলেন শিশুপালকে।

দুষ্ট মতি দুর্যোধন ফিরে এলেন হস্তিনায়। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য তাঁদের অন্তরে করল হিংসার উদ্রেক। বিষণ্ণ দুর্যোধন। ভাবতে লাগলেন পাণ্ডবদের ধ্বংসের কথা। এই অশুভ চিন্তায় ইন্ধন যোগালেন মাতুল শকুনি। পরামর্শে বসলেন দুজনে। পাশা খেলায় অদ্বিতীয় শকুনি। পাশা দ্বারাই করবেন তাঁদের পরাভূত। তাই আমন্ত্রণ জানালেন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায়।

যুধিষ্ঠির স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এ খেলার অন্তরালে রয়েছে অশান্তির দাহ। তবুও তাঁকে সাড়া দিতে হবে। কারণ তখনকার দিনের নিয়ম ছিল—যুদ্ধ বা পাশাখেলায় যদি কেউ জানায় আহ্বান, ইচ্ছা না থাকলেও দিতে হবে সাড়া। তাই তো কৌরবগণ এক রকম গায়ে পড়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার জন্য পাণ্ডবদের নামালেন ডেকে। পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির পারদর্শী নয়, কিন্তু পাশা-প্রেমিক বটে। গ্রহণ করলেন

দুর্যোধনের আমন্ত্রণ। কুন্তী, দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠির এলেন হস্তিনাপুরে।

যথা সময়ে উপস্থিত হলেন সভায়। দর্শকদ্বারা পরিবেষ্টিত চতুর্দিক। একদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, অপর পক্ষে দুর্যোধনের হয়ে খেলছেন শকুনি।

হৈ হৈ কাণ্ড। সভাস্থ সকলের মনেই উৎসাহের অভিব্যক্তি। পাশাখেলার নিয়মানুসারে পণে আবদ্ধ হলেন যুধিষ্ঠির।

কি সে পণ।

ভাইদের পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির। শুরু হল খেলা। শকুনির দানে চালে বারে বারে পরাভূত হতে লাগলেন যুধিষ্ঠির। জেদ তাঁকে মায়াবিনীর মত এগিয়ে নিয়ে চলল অমঙ্গলের অমা-আঁধারে। যুধিষ্ঠির দিশেহারা। কিন্তু তবু বিরত হলেন না খেলা থেকে।

ধন গেল। রত্ন গেল। হারালেন ভাইদের। অবশেষে প্রাণ প্রতীম দ্রৌপদীকে পণ রাখতেও কসুর করলেন না তিনি।

কিন্তু এবারেও হল তাঁর পরাভব। রাজেন্দ্রাণী নিমিষে রূপান্তরিতা হলেন দুর্যোধনের দাসীতে। বিনা মেঘে হল বজ্র-সম্পাত। সর্বনাশের অন্ধকার রাহুর মত গ্রাস করল দ্রৌপদীর ভাগ্যকে। অথচ এতসব বিপর্যয়ের সংবাদ কিছুই জানতেন না দ্রৌপদী। তাঁর দিন কাটছিল সুখে। অন্তরে তাঁর শান্তির পরিতৃপ্তি। স্বামী-গবিতা ধর্মানুরাগিণী সাধ্বী সতীর আবার বিপদ কি?

কিন্তু বিপদ তবুও এল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যকে যেন রাহুগ্রাস করল অতর্কিতে।

আনন্দে আত্মহারা দুর্যোধন। আদর্শ, বিবেক, ধর্ম বলতে কিছু রইল না তাঁর মনে। সভাস্থ গুরুজনদের করলেন তিনি অবমাননা। মত্ত উশৃঙ্খল দুর্যোধন দ্বারীকে আদেশ করলেন—যাও, এক্ষনি যাও। নিয়ে এসো দ্রৌপদীকে। আমার অপরাপর দাসীদের সঙ্গে সেও করুক এসে সভাস্থল মার্জন।

দ্বারী দুর্যোধনের আদেশ পেয়ে হাজির হলেন গিয়ে দ্রৌপদীর কাছে অন্তঃপুরে। সমস্ত সংবাদ নিবেদনান্তে বললেন—আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

নীরবে সব শ্রবণ করলেন দ্রৌপদী। কিন্তু হারালেন না ধৈর্য। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন দ্বারীকে—তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে শুধাও তিনি নিজে আগে হেরেছেন, না আমাকে আগে হারিয়েছেন।

ফিরে এলেন দ্বারী। শুধালেন যুধিষ্ঠিরকে। নীরব তিনি। বসে রইলেন আনত মস্তকে।

দুর্যোধন বজ্রকণ্ঠে বললেন দ্বারীকে—এ প্রশ্ন সভায় এসে তাঁকে করতে বল।

আবার এলেন দ্বারী।

দ্রৌপদী বললেন—বেশ, তাহলে তুমি সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞেস করে এসো, এখন কি আমার কর্তব্য।

দ্বারী এসে বললেন সবাইকে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বললেন না।

অসহায় যুধিষ্ঠির। অনন্যোপায় হয়েই অবশেষে দূত পাঠালেন পাঞ্চালীর কাছে। লিখে দিলেন—একবস্ত্রা রজস্বলা তুমি এখন। এই অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে দাঁড়াও শ্বশুরের সামনে।

ওদিকে দুর্যোধন অস্থির। তিনি দ্রৌপদীর আগমনে কাল হরণ হচ্ছে দেখে সত্বর তাঁকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন দুঃশাসনকে। অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটে চললেন দুঃশাসন। ছুটে চললেন বায়ুবেগে। উপস্থিত হলেন এসে দ্রৌপদীর সমীপে। বলতে লাগলেন বিনাদ্বিধায়—কৃষ্ণা তুমি এখন অপরের হয়ে গিয়েছ। তুমি বিক্রীতা। কাজেই আর লজ্জা সরমের বালাই রেখ না। ওগুলো অবিলম্বে পরিত্যাগ করে শিঘ্র সভায় গিয়ে উপস্থিত হও। দেখা কর দুর্যোধনের সঙ্গে। কৌরবদের সেবায় কর আত্মনিয়োগ।

দ্রৌপদী মুহূর্তে ভেবে নিলেন—কি করবেন। দুঃশাসন যে

দুর্বিনীত সে সম্বন্ধে দ্রৌপদী সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাই তিনি তাঁর কবল থেকে তার সতীত্ব রক্ষা করবার জন্য গান্ধারীর কাছে যেতে উদ্যত হলেন।

দুঃশাসন ধরে ফেললেন দ্রৌপদীর অভিসন্ধি। আর এক মুহূর্তও সময় দিলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কেশাকর্ষণ করলেন দ্রৌপদীর। দাঁড়ালেন পথ রুদ্ধ করে।

বুদ্ধিমতি দ্রৌপদী তখন ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—আপন বিকৃত বুদ্ধির তাড়ণায় তোমার নিজের অমঙ্গলকে ডেকে এনো না দুঃশাসন। আমি রজস্বলা। একবস্ত্রা। এ অবস্থায় আমাকে তুমি সভায় নিয়ে যেও না।

কে শোনে সে কথা? দুঃশাসন অশান্ত, উদ্বেল। তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় বইছে তখন উষ্ণ প্রস্রবন। কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে। লালসায় অধীর। তার যৌবনের দুরন্ত সমুদ্রে অশেষ উচ্ছাস। কি করে তিনি এমন একটি উপাদেয় ভোগ্য বস্তু পেয়ে আদর্শের কাঠিন্যে বেঁধে রাখবেন নিজেকে? না না তা হয়না। দ্রৌপদীকে কম্প্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন—রজস্বলা, একবস্ত্রা অথবা বিবস্ত্রা যাই হওনা কেন, তুমি যখন আমাদের, তখন আমাদের সেবায় তোমাকে চাই-ই-চাই।

তড়িৎ বেগে দুঃশাসন প্রায় অর্ধনগ্না করে এনে দাঁড় করালেন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে।

লজ্জায় আনতা দ্রৌপদী। তাঁর প্রাণের স্পন্দন প্রায় স্তব্ধ। স্বেদ-সিক্ত দেহ। কাঁপছেন থর থর করে ক্রোধের অগ্নি দহনে। আর যেন ধৈর্যের বাঁধ থাকছে না তাঁর। দীপ্তকণ্ঠে দুঃশাসনের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন দ্রৌপদী—'শোন দুঃশাসন, যে পাপাচার তুমি আজ করলে, আমার নারী ধর্মের শুচি শুদ্ধতায় যে কলঙ্কের কালি আজ লেপে দিলে, থাকনা ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার সহায়, পাণ্ডবগণ কোনদিন তোমাকে ক্ষমা করবে না মনে রেখো। তাঁরা ভাগ্য হত,

বিরম্বিত বটে, কিন্তু ধর্ম তাঁদের সঙ্গী হয়ে চিব দিন স্বপক্ষে থাকবে।

নীরব নিথর সভাস্থল। কাবো মুখে কথাটি নেই। যেন সব স্থানুব মত নিশ্চল পাষাণ হয়ে গিয়েছে। দ্রৌপদী এবারে দেবতাদের মনে ধরিয়ে দিলেন জ্বালা। বলতে লাগলেন বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে—ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র একটি নারীর এ অবমাননা নীরব দর্শকের মত বসে বসে প্রত্যক্ষ কবছেন? তাঁরা বিন্দু বিচলিত নয়! ধিক! ধিক! ভরত বংশ! আপনারা ধর্মভ্রষ্ট। চরিত্রভ্রষ্ট।

ঠিক এমনি সময়ে দুঃশাসন-'দাসী, দাসী' বলে চীৎকাব করে উঠলেন। এগিয়ে গেলেন তাকে উৎপীডন কবতে। দ্রৌপদীর এ অবস্থা অবলোকন করে মৃদু শ্লেষের হাসি হাসলেন কর্ণ। এবারে ভীষ্মের মুখে হল বাক্য স্ফুরণ— ভাগ্যবতী, ধর্ম এবং তাব তত্ত্ব অতিব জটিল ও সূক্ষ্ম। তাই তোমার এ জাতীয় লাঞ্ছনায় আমি মর্মাহত বটে, কিন্তু নীরব থাকতে বাধ্য হচ্ছি। রাজা যধিষ্ঠিব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বাক্য অভ্রান্ত। তাঁর মুখে কখনো মিথ্যা উচ্চারিত হয় না। এ ক্ষেত্রে নিজেই তিনি 'বিজিত' বলে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, শকুনির শঠতা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সন্দিহান।

ভীষ্মের কথা শ্রবণ করে তাঁর জবাবে দ্রৌপদী বললেন—যুধিষ্ঠিব সৎ বলেই শঠতা বোঝেন না। স্বেচ্ছায় তিনি পাশা খেলতে যান নি। এর পেছনে ছিল একটি অপকৌশল। তা বুঝতে পারেন নি বলেই খেলা খেলেছেন। বাবে বাবে হেরেছেন। উপস্থিত কুরুবংশীয় কন্যা ও কুলবধূদের অভিভাবকদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরাই বিচার করুন এবং বলুন এ দ্বারা আমি বিজিতা কি-না?

এবারেও কারো মুখে কথাটি উচ্চারিত হল না। নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে রইলেন সবাই অপলক। দ্রৌপদীব অসহায় প্রার্থনা ব্যর্থতার শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে বহু দূরে। এমন একটি মুহূর্তে দ্রৌপদী যদি চীৎকাব করে কাঁদতে পারতেন, তবে বুঝি শান্তি

ছিল। কে তাঁর এই বিপদ সঙ্কুলক্ষণে প্রসারিত করে দেবেন অভয়ের হস্ত। পঞ্চস্বামী থেকেও দ্রৌপদী আজ এত বড় পৃথিবীটায় বড় একা! বড় অসহায়! কেউ নেই তাঁর পাশে!

সহসা কৌরবদের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভার স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সকলের দৃষ্টি তাঁরই দিকে। তিনি এ কাপুরুষোচিত নীরবতাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—'রাজাদের ব্যসনাসক্ত হওয়ার উপাদেয় উপাদান হল, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, মদ্যপান এবং অধিক স্ত্রী সংসর্গ। যুধিষ্ঠির সেই দুষ্ট আসক্তির তাড়নায় দ্রৌপদীকে রেখেছিলেন পণ। কিন্তু তিনি ছাড়াও অপর পাণ্ডবগণ তাঁর স্বামী। অতএব তিনি একা তাঁকে পণ রাখতে পারেন না। তাছাড়া প্রথমে তিনি নিজে হারিয়েছেন তাঁর কর্তৃত্ব। তারপরে পণ রেখেছেন দ্রৌপদীকে। এক্ষেত্রে তাকে কিছুতেই চিহ্নিত করা যায় না বিজিতা বলে।

কর্ণ ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতিবাদ করলেন বিকর্ণের কথার। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি মানেই সভাস্থ সকলে দ্রৌপদী যে বিজিতা একথা মেনে নিয়েছেন বুঝতে হবে। দ্রৌপদী তো যুধিষ্ঠির ছাড়া নয়। তিনি তো তাঁকে নিজেই পণ রেখেছেন। বড় ভাইয়ের এ আচরণে পাণ্ডবগণ কেউই কোনো আপত্তি করেন নি। সুতরাং দ্রৌপদী যে 'বিজিতা' এ সম্বন্ধে কারো কোনো দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি থাকতে পারে না। তাছাড়া স্ত্রীলোকের একজন স্বামীই শাস্ত্র স্বীকৃত। কিন্তু দ্রৌপদীর? অনেক পতি। অতএব আমি বলব, দ্রৌপদী পতিতা! ভ্রষ্টা! বহুবল্লভা।

দুঃশাসনের পানে তাকিয়ে বললেন—সুতরাং হে দুঃশাসন, তুমি বিনাদ্বিধায় পাণ্ডবদের বস্ত্র হরণ কর। আর দ্রৌপদীর নগ্ন সৌন্দর্য দর্শন করাও সভাস্থ সকলকে।

কর্ণের কথা শ্রবণ মাত্র পাণ্ডবগণ নিজেরাই অঙ্গ থেকে ফেলে দিলেন উত্তরীয়। দুঃশাসন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্রৌপদীর 'পর। টানতে

লাগলেন বস্ত্র ধরে। চাইলেন সভাস্থলে তাঁকে বিবস্ত্রা করে ফেলতে।

লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন দ্রৌপদী। ভয়ে ভীতা। থর থর করে কাঁপছে তাঁর দেহ। আর যেন পারছেন না তিনি। পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। ডাকতে লাগলেন মনে মনে বিপদ ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁর নিজস্ব সত্তা হল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। যা করেন কৃষ্ণ!

যার কেউ নেই, তাঁর পাশে এসে কোটি জনতার শক্তি নিয়ে দাঁড়াল একজন। তিনি স্রষ্টা। তিনি দ্রষ্টা। তিনি রক্ষক। আবার তিনি সংহারও করেন বটে। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি বিনাশ সাধন করে চলেছেন অধর্মের।

দ্রৌপদী যে স্মরণ নিয়েছেন সেই পরম পুরুষের। তাইতো শরণাগতই রক্ষা করল তাঁর সতীত্বকে। স্বয়ং ধর্ম হলেন সহায়। বস্ত্রের রূপ ধারণ করলেন তিনি। আবৃত করলেন দ্রৌপদীর অঙ্গ। আপ্রাণ বস্ত্র টানছেন দুঃশাসন। কিন্তু অশেষ, অনন্ত, অসীম এ বস্ত্রের পরিমাণ। তার তো শেষ নেই। কে পারে দ্রৌপদীকে নগ্না করতে? কে পারে তাঁর দেহের সুগন্ধী পাপড়ীগুলোর আঘ্রাণ নিতে।

দুঃশাসন অবাক। সভায় সৃষ্টি হল কোলাহলের। সকলে মুখর হয়ে উঠলেন দুঃশাসনের নিন্দায়। দ্রৌপদীর প্রশংসায় হয়ে উঠলেন পঞ্চমুখ।

ভীম আর পারছেন না ধৈর্য ধরে থাকতে। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তাঁর অন্তরকে করে তুলল অস্থির। এবারে তিনি তাঁর স্বরূপে করলেন প্রত্যাবর্তন। জেগে উঠল তাঁর পুরুষকার। বলতে লাগলেন তিনি—'এতক্ষণ দেখছিলাম। কিন্তু না, আর নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যায় না। কারণ নারীর এ জাতীয় লাঞ্ছনা অসহ্য। তাই আমি অঙ্গীকার করছি, ভরত বংশের কুলাঙ্গার ও কৌরবদের কলঙ্ক এই দুঃশাসনের বক্ষ রক্ত যে দিন পান করতে পারব, সেদিন হবে আমার তৃপ্তি।'

ভীমের প্রতীজ্ঞা শুনে ভীত হলেন সকলে। তাঁরা নিন্দা করতে লাগলেন দুঃশাসনের! এদিকে বস্ত্র টেনে টেনে দুঃশাসন শ্রান্ত, ক্লান্ত। এক সময় বসে পড়লেন তিনি। রাশীকৃত কাপড়, স্তূপীকৃত কাপড়! দুঃশাসন ও এক সময়ে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। আর যেন দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তি নেই তাঁর দেহে। বসে পড়লে শ্রান্ত দুঃশাসন কাপড়ের স্তূপের পার্শ্বে।

বিদুর এতক্ষণ সব দেখছিলেন নীরবে। এবারে মুখ খুললেন—'এখনো আপনারা কেউ দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দেননি। একমাত্র বিকর্ণই তাঁব বুদ্ধিমত্তাব পরিচয় দিয়েছেন। এবারে আপনারাও আশাকবি দ্রৌপদীব কথার জবাব দেবেন।'

ক্রন্দসী দ্রৌপদি। লজ্জায় যেন মুখ তুলতে পারলেন না। অসহায়ার কান্না ভীষ্মকে আঘাত করল। তিনি আবাব বলতে লাগলেন—'ধর্মের পথ জটিল ও দুর্বোধ্য বলেই আমরা নীরব ছিলাম। লোভে মত্ত। বিনাশও আসন্ন। তুমি বিজিতা কিনা সে প্রশ্নের উত্তব দেবে যুধিষ্ঠির। কারণ সে ধর্মাশ্রয়ী। মিথ্যা বলা তাঁর চরিত্রে নেই।'

পিতামহের বাক্য শ্রবণ করে একটু হাসলেন দুর্যোধন। অবশেষে বললেন—'পাঞ্চালী, ভীম অর্জুনরা যদি এখন বলে, যুধিষ্ঠির তোমার পতি নয়, তবে আমি বলব, তারা মিথ্যা বাক্য ব্যয় করছে। বরং যুধিষ্ঠিবই বলুক, সে তোমার স্বামী কি-না?

দুর্যোধন এক সময়ে সরাসরি যুধিষ্ঠিরকেই প্রশ্ন করে বসলেন। এবং দ্রৌপদীকে অশ্লীল ভাবে কাপড় সরিয়ে উরু দেখালেন।

ভীম গর্জন করে উঠলেন—'এই আমি দ্বিতীয় বার প্রতিজ্ঞা করছি, সম্মুখ সমরে ঐ উরু যদি আমি গদার ঘায়ে ভাঙ্গতে না পারি, তাহলে যেন আমার পিতৃলোকে যাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।'

বিদুর তখন স্মরণ করিয়ে দিলেন কৌরবদের পাপের কাহিনী। যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পূর্বেই পণ রাখতে পারতেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বিজিত হবার পরে রেখেছেন তাকে পণ।

তোমরা এ বিষয় সম্পূর্ণ অবহিত। অথচ তবুও তোমরা সভাস্থলে নিয়ে এসেছ একজন স্ত্রী লোককে।

বাইরে তখন অশুভ সংকেতে শিয়াল ডেকে উঠল। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সজাগ করিয়ে দিলেন সবাই। নিজেও তিনি তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছিলেন। তাই দুর্যোধনকে তিরস্কার করতে লাগলেন। পাঞ্চালীকে সম্বোধন করলেন স্নেহ-শিক্ত কণ্ঠে—"পাঞ্চালী, তুমি বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা। আদর্শবতী ও ধর্মশীলা নারী তুমি। এবারে আমার কাছে বর প্রর্থনা কর!

শ্বশুরের সান্ত্বনা দ্রৌপদীর অন্তরকে স্পর্শ করল। তিনি আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'সর্বধর্মে আস্থাবান যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মোচন করুন। আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে দাসীপুত্র অ্যাখ্যা থেকে মুক্তি দিন! মঞ্জুর করলেন তা ধৃতরাষ্ট্র। এবং বললেন এবারে তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর!

দ্বিতীয় বর প্রার্থনা দ্বারা দ্রৌপদী অন্য চার স্বামীর মুক্তি ভিক্ষা করলেন।

এবারে তোমাকে আমি তৃতীয় বর দিতে প্রস্তুত।

বললেন দ্রৌপদী—আর তো কিছু প্রার্থনার নেই আমার। স্বামীরা মুক্ত হলেই তাঁদের দ্বারাই লাভ হবে আমার সুখ শান্তি।

সভার সকলে এবারে দ্রৌপদীর সত্য ও নিষ্ঠায় 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

যুধিষ্ঠির মন্থর পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে—'এখন আমার কি কর্তব্য বলুন।'

ধৃতরাষ্ট্র বলেন—'তুমি অজাতশত্রু, ভগবান তোমার সহায় হোন। ধন, রত্ন, রাজ্য যা হারিয়ে ছিলে, সব তোমারই। তা নিয়ে ফিরে যাও রাজ্যে। প্রজানুরঞ্জনে কর গিয়ে আত্মনিয়োগ। ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এবারে প্রত্যাবর্তন কর ইন্দ্রপ্রস্থে। পাণ্ডবেরা সভাস্থল ত্যাগ করলেন। পিতার ব্যবহারে দুর্যোধন হলেন ক্ষুব্ধ।

তাঁরা বৃদ্ধ পিতাকে ওদের ডেকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলেন। স্নেহাসক্ত পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার তাদের ডেকে পাঠালেন। ওরা যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। পারলেন না ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে। এদিকে আবার আয়োজন করা হয়েছে পাশা খেলার। তবে এবারে পণ রাজ্য নয়, বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাস।

শকুনির সঙ্গে আবার পাশা খেলতে বসলেন যুধিষ্ঠির। পরিণামের হল পুনরাবৃত্তি।

সভা ত্যাগ করলেন পাণ্ডবগণ। গুরুজনদের চরণে প্রণাম রাখলেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বিদুরের গৃহে মাতৃদেবী কুন্তীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। সুভদ্রাকে পাঠালেন কৃষ্ণের আশ্রয়ে দ্বারকায়। দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব যাত্রা করলেন বনবাসে। যাবার প্রাক্কালে দ্রৌপদী কুরুকুল নারীগণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অভিমানে হিংসায় ক্রোধে দগ্ধা দ্রৌপদীর নয়নে জল। তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—'তোমাদের স্বামীদের দ্বারা আমি যে রূপ বিবস্ত্রা হয়েছি, বিস্রস্তা কেশে বনগমন করছি, ফিরে এসে আমি দেখব তোমাদেরও সেই দশা হয়েছে। আর দেখব পতিপুত্র, কন্যা হীনা তোমরা মৃতগণের তর্পণ করে অশ্রু সজল নয়নে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করছ।

সহসা নারদ এসে উপস্থিত হলেন ধৃতরাষ্ট্রের সভায়। তিনি বললেন—'ওদের প্রতিজ্ঞা পালনের পর তের বছর অন্তে কৌরবরা ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে।

অদৃশ্য হলেন নারদ। পাণ্ডবগণ এগিয়ে চললেন বনের পথে।

সবুজের অরণ্যে পাখীদের কলতান। ধ্যান শান্ত পরিবেশ। ওঁদের দিনগুলো সুখেই কাটতে লাগল। ধর্মরাজ এসেছেন বনে। সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কত মুনি ঋষি আসতে লাগলেন। গ্রহণ করতে লাগলেন ধর্মরাজের কাছে নানা উপদেশ।

ছায়া সঙ্গিনী দ্রৌপদী। পরম আনন্দে করতে লাগলেন অতিথিদের

সেবা যত্ন। ধার্মিক স্বামীর পাশে সতী লক্ষ্মী দ্রৌপদী ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে কাটাতে লাগলেন দিন। বিরাট রাজবংশের কন্যা হয়েও অরণ্যের কংটকসঙ্কুল শয্যা পরম সুখপ্রদ বলে মনে হল। স্বামীর পাশে পাশে রাজরাণী ভিখারিণীর মত থাকতেও ক্লেশ-ক্লান্ত হলেন না।

পাণ্ডবদের বনবাসের সংবাদ শ্রবণ করে বহু রাজণ্যবর্গ এলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। কৃষ্ণ ও এলেন। ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। চাইলেন ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে দিতে। কিন্তু অর্জুন করলেন তাঁকে শান্ত। দ্রৌপদীর বুকের ব্যথা এত কাল পরে কৃষ্ণ দর্শনে উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—'হে কৃষ্ণ, ব্যাস তোমাকে বলেন দেবের ও দেব। পাণ্ডবদের স্ত্রী আমি। তোমার প্রীতি বিধানকারী সখী আমি। এ বিশ্ব চরাচরের ঈশ্বর তুমি। তাই আজ বড় দুঃখে আমার আপন জনের কাছে জানাচ্ছি আমার বেদনার্ত জীবনের কাহিনী। বল, তুমি বল, কেন দুঃশাসন আমাকে টেনে নিয়ে গেল সভাস্থলে? লজ্জাভ্রষ্টা আমি থর থর করে তখন কাঁপছি বেতস পত্রের মত। আমার এ অবস্থা দেখে কৌরবেরা হেসে উঠল। তারা চাইল আমাকে দাসীর মত ভোগ করতে। আমার এতবড় বিপদেও তারা কেউ অসহায় নারীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না! হে কৃষ্ণ, কেন বীরগণদ্বারা আমি অপমানিত হলাম? মহৎ বংশ পেয়ে এবং মহৎকুলের স্ত্রী হয়েও আমি কেন দুঃশাসন দ্বারা হলাম কেশাকর্ষিতা?'

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান অসম্মানে জর্জরিতা দ্রৌপদী দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে কেঁদে বললেন—'হে মধুসূদন, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার কেউ নেই! কিছু নেই! স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা কেউ তো এসে আমার বিপদের দিনে দাঁড়াল না! এমন কি তুমিও না। আমি নির্যাতিতা হয়েছি। লাঞ্ছিতা হয়েছি। কর্ণ দ্বারা উপহসিতা হয়েছি। আজ ভাবছি আমি কি হইনি! এবং তা ক্ষমতাহীনদের দ্বারা! হে কৃষ্ণ তুমি না বিপদ তারণ মধুসূদন? তাছাড়া তুমি আমার আত্মীয়, বন্ধু,

সখা ও প্রভু। আমার চরম লাঞ্ছনার দিনেও তো তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়ালে না।

নীরবে এতক্ষণ শুনছিলেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণার দুঃখের কাহিনী। এবারে তিনি বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণা ধৈর্য ধর। তুমি যাদের 'পর রুষ্টা হয়েছ, যারা তোমাকে লাঞ্ছনা দিয়েছে, অর্জুনের বান একদা তাদের রক্তাক্ত দেহ এই ভূমি—শয্যায় চির নিদ্রায় নিদ্রিত করে দেবে। দ্রৌপদী তাকালেন এবারে অর্জুনের পানে। অর্জুন আশ্বস্ত করলেন তাকে—'আর কেঁদনা দেবী। বাসুদেবের কথাই সত্যি হবে। তাঁর সাহায্যে আমরা আমাদের শত্রু নিধন করব। অপেক্ষা কর একটু। শিগগিরই তার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেদিন তোমার স্বামীরা আর নীরব থাকবে না।'

কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথায় নিবৃত্তা হলেন পাঞ্চালী। বস্ত্রের আঁচলে মুছলেন আঁখিধার। অপেক্ষা করতে লাগলেন সে শুভ দিনটির জন্য।

এবারে অনেকটা প্রশান্ত হয়েছেন দ্রৌপদী। স্বামীদের নিয়ে সেবা, যত্নে সুখে কাটছিল তার দিনগুলো। এমনি সময় এলেন একদিন শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামা। তিনি দ্রৌপদীকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এক পতিকে প্রীত করতে পারেন না তিনি, আর দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর অন্তর জুড়ে রয়েছেন পরম আদরণীয়া হয়ে। একি করে সম্ভব?—কোন মন্ত্র বলে, কোন ব্রত পালনে অথবা কোন ওষধিদ্বারা তুমি তোমার স্বামীদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছ? আমাকে বলে দাও সে উপায়টি। আমি কৃষ্ণকে তাই দিয়ে বশে আনব।

দ্রৌপদী বললেন—'কোন মন্ত্র, ব্রত বা ওষধি দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না। ও সব ভ্রান্ত চিন্তা। প্রগাঢ় প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা ও আসক্তহীন হয়ে সেবা যত্ন দ্বারা যে জয় সাধিত হয়, তা চির অক্ষুন্ন। চির অভঙ্গ। আমি যে তাঁদের সুখেই নিজে সুখে থাকি। আমার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই, তাঁদের প্রীতি পূর্ণ হাসিই আমার আনন্দের উৎস'-সত্যভামা।

পাঞ্চালীর পানে তাকিয়ে সত্যভামা বললেন—সখি, এতক্ষণ তোমাকে পরিহাস করছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর পাঞ্চালী। তুমি কোন চিন্তা করনা। একদিন তোমার পতিরা জয় লাভ করে রাজ্য ফিরে পাবেনই। তোমার পাঁচ ছেলে ভালই আছে। সুভদ্রা তাঁদের পরম যত্নে আঁচলের আড়ালে রেখে করছেন লালন পালন।

সত্যভামা রথে উঠলেন। দ্রৌপদী জানালেন তাঁকে বিদায় সম্ভাষন।

দেখতে দেখতে বনবাসের দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

ছন্দ বদ্ধ জীবন। সকলের আহার শেষে দ্রৌপদী গ্রহণ করেন অন্ন। তাঁর আহারের অবশিষ্ট থাকেনা কিছুই। সেদিন ঘটল এক ঘটনা। দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেছে। যাবেন তিনি বিশ্রামে। এমনি সময়ে দেখতে পেলেন অদূরে দুর্বাসা অযুত শিষ্যদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন কাম্যবনের দিকে। দ্রৌপদী পরলেন মহাবিপাকে। যুধিষ্ঠির বললেন দুর্বাসাকে—'ভগবান, স্নান-আহ্নিক সমাপনান্তে সত্তর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করুন।'

দুর্বাসা যুধিষ্ঠিরের কথা মত শিষ্যদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন নদীতীরে। দ্রৌপদী অনন্যোপায়। কি তিনি খেতে দেবেন? কিছুই তো নেই। কি উপায় হবে ওঁরা স্নান করে ফিরে এলে? কান্না পেল দ্রৌপদীর। স্মরণ করলেন বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে—'হে অগতির গতি, তুমি আমাকে বিপদ মুক্ত কর।'

ভক্তের কান্না ভগবানের অন্তরে সাড়া জাগাল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তখন রুক্মিনীর কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। সব কথা বললেন দ্রৌপদী। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই বলে বসলেন—ওগো, আমি বড় ক্ষুধার্ত। অগ্রে আমাকে খেতে দাও। তার পরে ভাবা যাবে ওদের কথা।

দ্রৌপদী ভীষন লজ্জার মধ্যে পড়লেন। করতে লাগলেন ইতস্ততঃ

কৃষ্ণ বললেন—কি ভাবছ বসে? তোমার খাবারের হাড়িটা নিয়ে এসো।

তাই করলেন দ্রৌপদী। হাড়িতে লেগে আছে একধারে একটুকরো শাকান্ন। পরমতৃপ্তি ভরে কৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তা। তুললেন ঢেকুর। বললেন তৃপ্তোঽস্মি'। 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'।

মুনিরা স্নান করতে নেমেছেন তখন নদীতে। এমনি সময় তাঁদের পরম তৃপ্তিকর ঢেকুর উঠতে লাগল। যেন পেট ভরে খাওয়া হয়ে গেছে। প্রত্যেকেরই একভাব। বিস্ময়ের অন্ত থাকেনা তাদের। দুর্বাসাকে বলেন শিষ্যরা—'মনে হচ্ছে যেন আকণ্ঠ ভোজন করেছি, আমরা এখন আর কি করে খাবো?'

তখন দুর্বাসা বললেন—'তবে আর গিয়ে কাজ নেই, চলো ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই স্থান ত্যাগ করি।'

এদিকে দুর্বাসা প্রভৃতিকে ডাকবার জন্য নদীতীরে এসে হাজির হয়েছেন সহদেব। কিন্তু কই, কেউ নেই তো! ফিরে গেলেন সহদেব। সকলকে গিয়ে দিলেন এই সংবাদ। পরম প্রীত সকলে। পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে গিয়ে বললেন—হে বাসুদেব, তোমাকে কাণ্ডারী করে সাগর পাড়ি দেওয়া যায় ভাবনাহীন হয়ে।

কৃষ্ণ তুষ্ট করলেন সকলকে। চলে গেলেন দ্বারকায়।

আর একদিনের ঘটনা। পাঁচ ভাই মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। দ্রৌপদী ঘরে একাকী। তখন এলেন অতিথি।

কে তিনি?

সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ এসে হাজির হলেন কাম্যবনে।

কেন?

এই বনবন্ধুর দুর্গম দিগন্ত অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তিনি শাল্বরাজ্যে। যেতে যেতে সহসা তাঁর দৃষ্টি গেল স্থির হয়ে। অদূরে বনমধ্যে কুটিরাভ্যন্তরে দেখতে পেলেন এক লোভন মধুর শোভন সুন্দর নারী মূর্তি। তাঁর দেহ-দ্যুতি, তাঁর আনন-চ্ছটা যেন বনের অন্ধকারকে

আলোকিত করে দিয়েছে। মন্থর হল জয়দ্রথের গতি। কোটিকাম্যকে শুধালেন নারীর পরিচয়।

কোটিকাম্য এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। বিনীতভাবে আপন পরিচয় প্রদান করে বললেন—'কে আপনি? পরিচয় কি?'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজা দ্রুপদের একমাত্র কন্যা আমি। নাম কৃষ্ণা! এ ছাড়াও আমার আর একটি পরিচয় আছে।'

জিজ্ঞাসু নয়নে তাকালেন কোটিকাম্য। দ্রৌপদী বললেন তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়—'পঞ্চ পাণ্ডবেরও একমাত্র স্ত্রী আমি-ই।'

কোটিকাম্য এবারে নিবেদন করলেন জয়দ্রথের পরিচয়। দ্রৌপদী বললেন—'যদিও আমার স্বামীরা কেউ নেই কুটিরে, তাঁরা বনমধ্যে গিয়েছেন মৃগয়া করতে। তবুও বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন আমার আতিথ্য।'

দ্রৌপদীর কাছ থেকে সব কিছু জেনে বললেন গিয়ে কোটিকাম্য রাজা জয়দ্রথকে। জয়দ্রথ অশান্ত। উদ্বেল। তিনি কোটিকাম্যকে বললেন—'জান কোটিকাম্য, এ নারীকে দর্শন করে আমার কি মনে হচ্ছে?'

—কি রাজা?

—মনে হচ্ছে অন্য সব রমনী এ নারীর কাছে বানরীর মত। চল আতিথ্য গ্রহণ করে ওর সান্নিধ্য প্রার্থনা করি।

কয়েকজন সঙ্গী সহ জয়দ্রথ এসে দাঁড়ালেন দ্রৌপদীর কাছে। দৃষ্টি স্থির। বক্ষ পঞ্জরের মধ্যে যেন অবাধ্য নর্তন জয়দ্রথকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। দ্রৌপদী রাজাকে প্রদান করলেন রাজোচিত আসন। উপবেশন করলেন রাজা। দ্রৌপদী বললেন—মহারাজ, প্রাতঃ ভোজনের নিমিত্ত আমি আপনার পরিষদদের পঞ্চাশটি হরিণ দিচ্ছি। মৃগয়া থেকে ফিরে এসে যুধিষ্ঠির আপনাদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করবেন।

দ্রৌপদীর বীণা নিন্দিত কণ্ঠ জয়দ্রথের কর্ণে মধু বর্ষণ করল। তিনি অপলক তাকিয়ে রইলেন। আহা কি রূপ! নিটোল দেহ। আনিতম্ব

কেশদাম, ছিলাটানা ধনুকের মত বাঁকা ভুরু। আয়ত দীপ্ত আঁখি প্রস্ফুট পদ্মের মত মুখ। স্তনভারে ঈশৎ আনত বক্ষ। আর যেন চোখ ফেরাতে পারছেন না রাজা। তার কাম-কুঞ্জে বসন্তের সমারোহ। কি করে থাকবেন তিনি ধৈর্যের শীলাসনে কাঠিণ্যের বেষ্টনে আবদ্ধ? তাই তো অর্বাচিনের মত প্রলুব্ধ জয়দ্রথ বলে ফেললেন—'হে শোভনা, আমি এখানে প্রাতঃরাশের প্রত্যাশায় আসি নি। এসেছি তোমারই প্রত্যাশায়: চলো কৃষ্ণা, আমার সঙ্গে চলো। আমার ভার্যা হয়ে রাজ সুখে সুখী হও। কি হবে এই দীন, হীন পাণ্ডবদের সঙ্গে কালক্ষেপ করে।

সহসা যেন বজ্রপতন হল। একজন অতিথির কাছ থেকে এ জাতীয় ব্যবহার আশা করেন নি দ্রৌপদী। তাই রাগে, ক্ষোভে, অসম্মানে অগ্নি মূর্তি ধারণ করলেন তিনি। বললেন—তুমি অর্বাচীন, তুমি মূর্খ। নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চোখে দৃষ্টি আছে তোমার? আগামী দিনগুলো দেখতে পাচ্ছ? বীর, যশমান, পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কি বলছ তুমি মূঢ়। লজ্জাহীন কুকুরের মত নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনবার জন্য নিদ্রিত সিংহ আর বিষধর ফণীকে পদাঘাত করতে যাচ্ছ তুমি। সাবধান হও। এখনো সময় আছে। তুমি তোমার কু-কার্য থেকে বিরত হও রাজা!

মদমত্ত জয়দ্রথ! প্রমত্ত নদের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল দ্রৌপদীর দেহ-তটে। ওখানে পোত নির্মাণ না করতে পারলে তাঁর চলবেনা। তাই এত সব কটুবাক্য শ্রবণ করেও জয়দ্রথ বিনাদ্বিধায় বলতে লাগলেন দ্রৌপদীকে—স্বেচ্ছায় আরোহণ কর আমার রথে। আমার 'পর হও তুমি নির্ভরশীল।

দ্রৌপদী এবারে গর্বভরে বলতে লাগলেন—'তুমি মনে করোনা আমি বলহীনা, আশ্রয়হীনা কেউ। তোমার কাছে কেন যাব আমি কৃপা প্রার্থিনী হয়ে? আমার স্বামী অর্জুন সিংহের বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার সৈন্যদের ওপর। ভীমের পদাঘাতে তোমার বিকৃত

মস্তিষ্ক হবে ধূলায় ধুসর। নকুল সহদেবের ক্রোধের অনল তোমাকে করবে ভস্মীভূত। এখনো সংযত হও। এখনো অনেক সময় আছে পালিয়ে যাওয়ার মত।'

না এত সব হিতোপদেশেও ভ্রান্তি ভঙ্গ হল না জয়দ্রথের! তিনি দ্রৌপদীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। দ্রৌপদী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে! উচ্চস্বরে পুরোহিত ধৌম্যকে আহ্বান করছেন বারে বারে! কিন্তু ধৌম্য আসবার পূর্বেই জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে নিয়ে রথে উঠেছেন। এ দৃশ্য দেখে ধৌম্য শিউড়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন রাজা জয়দ্রথ—'তুমি ক্ষত্রিয়। পালন কর ক্ষাত্রধর্ম। সম্মুখ সমরে আগে পরাভূত কর পাণ্ডবদের। তারপরে দ্রৌপদীকে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করবে। তোমার এই ভীরু কর্মের ফল কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে।'

কে শোনে সে কথা? রাজার রথ ছুটল বায়ুর বেগে। অনন্যোপায় হয়ে জয়দ্রথের পদাতিক সৈন্যদের অনুগমন করতে লাগলেন ধৌম্য।

এদিকে পাণ্ডবদের মৃগয়া হয়ে গিয়েছে শেষ। তাঁরা নানা দিক থেকে এসে হলেন মিলিত। পরম আনন্দিত অন্তর। খুশী মনে হৈ হৈ করে আসছিলেন তাঁরা আশ্রমের দিকে। সহসা থমকে দাঁড়ালেন! ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীর প্রিয়ধাত্রী কন্যা। আলুলায়িত কুন্তলা মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। যুধিষ্ঠিরের রথের সারথী ছুটে গেলেন তার কাছে—'বল, বল, কি হয়েছে? কাঁদছ কেন? দ্রৌপদীদেবীর কোনো অমঙ্গল ঘটে নি তো?'

কন্যা ব্যস্ত কণ্ঠে জবাব দিল—জয়দ্রথ জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমরা শিগগির যাও। অনুসরণ কর।

পঞ্চ পাণ্ডব ছুটলেন ঝড়ের বেগে। কিছু দূর যেতেই শুনতে পেলেন পুরোহিত ধৌম্যের কণ্ঠস্বর। তিনি আপ্রাণ ডাকছেন ভীমকে। সাড়া দিয়ে ওঁরা আশ্বস্ত করলেন ধৌম্যকে। কিন্তু জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে রাগে ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন আগুনের মত।

জয়দ্রথেরও দৃষ্টি থেকে এড়াল না পাণ্ডবরা। রাজা জয়দ্রথ এবারে ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। অন্যান্য রাজাদের বললেন পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে। কিন্তু কেউই সে আহ্বানে দিল না সাড়া। অসহায় জয়দ্রথ ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক কষালেন। কিন্তু না, পালাবার উপায় আর রইল না। ভীমের গদার ঘায়ে বেরিয়ে গেল কোটিকাস্যের প্রাণ বায়ু। তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিলেন জয়দ্রথ। প্রাণের ভয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন বনপথে।

দ্রৌপদীকে নিয়ে রথে উঠলেন যুধিষ্ঠির। ভীম বললেন যুধিষ্ঠিরকে—দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও ধৌম্যকে নিয়ে ফিরে যেতে আশ্রমে! যাবার আগে বলে গেলেন যুধিষ্ঠির—জয়দ্রথ কিন্তু আমাদের আত্মীয় ভগ্নীপতি। গান্ধারীও দুঃশলার কথা মনে রেখে ওকে শাস্তি দিও। প্রাণে মেরে ফেলোনা তাকে।

দ্রৌপদী গর্জে উঠলেন--নারী অপহরণকারীকে ক্ষমা করা কোনো-ক্রমেই উচিৎ নয়।

ওঁরা চলে গেলেন আশ্রমে। ভীম এবং অর্জুন ছুটলেন জয়দ্রথের পিছু পিছু। কত দূর আর যাবেন তিনি। দূর থেকে অর্জুন মারলেন একটি বাণ। জয়দ্রথের রথের ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। থেমে গেল রথ। অর্জুন ত্রস্তপদ সঞ্চারে গিয়ে ধরে ফেললেন তাঁকে। বলতে লাগলেন শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে—এই বীরত্ব নিয়ে তুমি গিয়েছিলে দ্রৌপদীকে হরণ করতে? আশ্চর্য!

ভীম তার চুলের মুঠি ধরলেন। ফেলে দিলেন মাটিতে। মাথায় পদাঘাত। মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জয়দ্রথ। ভীম জয়দ্রথের মাথার চুল এলোমেলো করে কেটে দিলেন। অঙ্গীকার করালেন পাণ্ডবদের দাস বলে পরিচয় দিতে। প্রাণ ভয়ে সম্মত জয়দ্রথ। ভীম তাকে রথে এনে হাজির করলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। জয়দ্রথকে দেখেই হেসে ফেললেন সবাই। কয়েকটি মুহূর্ত আগে যিনি ছিলেন নারীহরণকারী

পরাক্রমশালী রাজা তিনি এখন লাঞ্ছিত অপমানিত ও বন্দী। পাণ্ডবদের দ্বারে প্রাণ-ভিখারী।

যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী উভয়েই ক্ষমা করলেন তাঁকে। বললেন—ছেড়ে দিতে। জয়দ্রথ তাঁর প্রাণভিক্ষা পেয়ে ফিরে গেলেন।

বনবাসের কাল শেষ হয়ে গেল। এবারে এক বছর অজ্ঞাত বাসের পালা। পাঁচ ভাই পরামর্শ করে উপস্থিত হলেন গিয়ে বিরাট নগরে। হলেন মৎস্যরাজের অতিথি। এখানেই একটা বছর কাটাবেন তাঁরা। তাই যুধিষ্ঠির পার্ষদ হলেন রাজার। নতুন নাম নিলেন—কঙ্ক।

কঙ্কের কি কাজ?

কঙ্ক পাশা খেলবেন রাজার সঙ্গে। করবেন তাঁকে রাজকার্যে সাহায্য।

ভীমের নাম হল বল্লভ।

বল্লভ হলেন সূপকার। প্রয়োজনে করবেন মল্লযুদ্ধ। সকলকে দেবেন আনন্দ।

অর্জুন?

তার 'পর ন্যস্ত হল রাজকুমারীদের নাচ শেখাবার দায়িত্ব। নাম হল তার বৃহন্নলা।

নকুল গ্রন্থিকর নাম নিয়ে নিযুক্ত হলেন অশ্বচিকিৎসক হিসেবে।

সহদেব পরিচিত হলেন তান্ত্রিপাল নামে। তাঁর উপরে দেওয় হল গোধনের ভার।

এবারে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন দ্রৌপদীকে নিয়ে। এমন যার রূপ যৌবন, তা কি দিয়ে, কোথায় গিয়ে ঢেকে রাখবেন তিনি? পাণ্ডবদের চিন্তার বোঝা লাঘব করলেন দ্রৌপদী। তিনি বললেন—আমি সৈরিন্ধ্রী নাম গ্রহণ করে পরিচারিকা হব রাজ মহিষীর। থাকব অন্তঃপুরেই। ওখানে থাকলে আমার পরিচয় কেউ কোনো দিনও জানতে পারবে না।

তাই হল। বিরাট রাজার স্নেহ প্রচ্ছায়ে ওদের দিনগুলো বেশ

ভালই কাটছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপ হল কাল। রাজ শ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে দর্শন করে হল মুগ্ধ। চাইল সে দ্রৌপদীর দেহবন্দরে পোত নির্মাণ করতে। আসঙ্গাতুর কীচক একদা ঝাঁপ দিল দ্রৌপদীর রূপের আগুনে। ধাক্কা মেরে সতীনারী সরিয়ে দিলেন তাঁকে। ছুটে গেলেন রাজার কাছে। কিচক হলেন না বিরত। রাজার সম্মুখেই কীচক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে মাটিতে ফেলে দিল। পদাঘাত করল তাঁকে। ভীমের দর্শন গোচর হল তা। দাঁতে দাঁত দিয়ে কোনো প্রকারে করলেন আত্মসম্বরণ। কিন্তু দ্রৌপদীর কান্না তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাল। কীচক বধ না করে তাঁর শান্তি নেই। একদিন রাত্রে গোপনে ভীমদ্বারা কীচক বধ সমাধা হল। দ্রৌপদী ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। জুড়াল তাঁর দেহ ও মনের জ্বালা।

অতিক্রান্ত হল বনবাস ও অজ্ঞাত বাসের কাল। এবারে ঘরে ফেরার পালা। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস থেকে মুক্ত হলেন। নিজেদের রাজ্য ফিরে চেয়ে কৌরবদের কাছে পাঠালেন দূত। যুধিষ্ঠির ও ভীম তাঁর কাছে বলে দিলেন—যদি রাজ্য দিতে তাঁরা অসম্মত হন, তবে পঞ্চ পাণ্ডবের বাসোপযোগী পাঁচখানি গ্রাম দিলেই আমরা খুশী হব।

সমস্ত প্রস্তাব দূত মুখে শ্রবণ করে দুর্যোধনের দুর্মতি হল। তিনি বললেন—বিনা যুদ্ধে এক কণা মাটিও আমরা দেব না।

নিরুপায় পাণ্ডবগণ। অশান্তি তাঁরা চান না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্য কিছু করবারও উপায় নেই। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে তাঁদের হবেই। জন্মভূমির মাটিকে শত্রু-মুক্ত না করতে পারলে জীবনই ব্যর্থ। শুরু হল যুদ্ধের আয়োজন। কৌরব পক্ষে তামাম বীর ও রাজাগণ করলেন যোগদান। কেউ ফিরে তাকালেন না পাণ্ডবদের পানে। কেবল দ্রুপদ রাজ' ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট রাজ এলেন পাণ্ডবদের পক্ষে। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ তখনো নীরব। কোনো পক্ষেই করেন নি তিনি যোগদান। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে দূত হিসেবে যেতে

বললেন কৌরবদের সভায়। শ্রীকৃষ্ণ যাবার জন্য সম্মত হলেন। কিন্তু দ্রৌপদী তাঁর পূর্বলাঞ্ছনার কথা বিস্মৃত হয়ে যাবার পাত্রি নন। তিনি অতি বিনীত কণ্ঠে কৃষ্ণ সমীপে নিবেদন করলেন—হে মধুসূদন। জ্ঞাতি বধের ভয়ে ভীত হয়ে সন্ধি করতে চাইছেন ধর্মরাজ। আমিও চাইনা অজস্র জ্ঞাতি বধ হোক। কিন্তু যে বধ্য, তাকে বধ না করা যে মহাপাপ এ কথা তোমার তো অজানা নয়। সুতরাং আমি শুধু একটি কথাই বলব মধুসূদন, আমাদের হৃতরাজ্য যদি কৌরবরা প্রত্যর্পণ করতে না চান, তবে সন্ধি করোনা।

বাসুদেব কৌরব সভায় গেলেন সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে। ওঁরা তাতে কর্ণপাতই করল না। উপরন্তু কৃষ্ণকে বলল তাঁদের পক্ষে যোগদান করতে। শ্রীকৃষ্ণ কোন কথা না দিয়ে বললেন—পরে জানাব।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল দ্বিগুণ উৎসাহে। কৃষ্ণকে অতিষ্ঠ করে তুললেন কৌরব। বারে বারে গিয়ে অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকে পক্ষভুক্ত করবার জন্য। কৃষ্ণ অবশেষে বললেন—আমার নিদ্রাভঙ্গে যার মুখ দেখব আগে, তার দিকে করব যোগদান।

এ আর এমন বেশী কি? ধনে জনে প্রভাব প্রতিপত্তিতে গর্বিত দুর্যোধন গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন শ্রীকৃষ্ণর শিরোদেশে! আর অর্জুন?

তার শরণাগতির পথ। প্রার্থনার পথ। নির্ভরতার পথ। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদতলে লইলেন আশ্রয়। এ যেন তাঁর নির্ভাবনার অভয় বন্দর। এ ঘাটে নোংগর বাঁধলে জাহাজের আর কোন ভয় থাকে না।

নিদ্রাভঙ্গ হল শ্রীকৃষ্ণের। তাকিয়ে দেখলেন পায়ের কাছে অর্জুন-কে। সিদ্ধ হলেন সাধনায় অর্জুন। অন্তরসম শ্রীকৃষ্ণ সাড়া দিলেন তাঁর ডাকে। দুর্যোধনকে বললেন—আমাকে পাণ্ডবপক্ষেই যেতে হল। তবে কৌরবদের পক্ষে থাকবে আমার সৈন্য সামন্ত।

দুর্যোধন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর অহংকারের মঠ মিনার-গুলো যেন মুহূর্তে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। তাঁর গর্বোদ্ধত শির হল অবনমিত। অশ্রুর অর্চনায় নিবেদন করলেন—হে জনার্দন, কথা দাও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেনা।

শ্রীকৃষ্ণ কথা দিলেন দুর্যোধনকে। পাণ্ডবদের হয়ে তিনি ধারণ করবেন না অস্ত্র।

যুদ্ধ সুরু হল। ঘোর যুদ্ধ। আঠেরো দিন যাবৎ চলল সংগ্রাম। রক্ত, মৃত্যু, হাহাকারে রণক্ষেত্র ভরে গেল। চলল মৃত্যুর তাণ্ডব। জ্ঞাতি হত্যার ভয়ে ভীত অর্জুন সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বিরত হবার জন্য জানালেন অনুরোধ। বললেন রথ ফেরাতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শোনাতে লাগলেন অর্জুনকে ধর্ম-কথা। দেখাতে লাগলেন যোগবিভূতি। অর্জুন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তাঁকে অস্ত্র চালাতে বাধ্য করল। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। হতাশায়, বেদনায় মূর্ছিত হবার উপক্রম। কৃষ্ণ দেখালেন অর্জুনকে বিশ্বরূপ। তামাম দুনিয়া তাঁরই মধ্যে সংহত হয়ে রয়েছে। চলেছে সেখানে নিত্য জন্ম মৃত্যুর রহস্য। যাদের বেদনায় অর্জুন মুহ্যমান প্রায়, দেখলেন বহু পূর্বেই তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে রয়েছেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তোমার অন্য কিছু ভাববার অবকাশ নেই। মামেকং শরণং ব্রজ। আমাকে স্মরণ কর।

আর কোন দ্বিধা নেই। দ্বন্দ্ব নেই। অর্জুন পরম উৎসাহে অস্ত্র ধারণ করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে।

কৌরব বংশ ধ্বংস হল। কৃষ্ণার অপমানকারী দুঃশাসনকে বধ করলেন ভীম। ছিঁড়ে নিলেন তার হৃৎপিণ্ড। পান করলেন তপ্ত রক্ত। দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গলেন। অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করলেন। ক্ষত্রিয় বংশের চিহ্ন মিলিয়ে গেল।

পাপের পরাক্রম ক্ষণস্থায়ী। মিথ্যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের জয় চিরকালীন। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রমান করল ভারত

আত্মার শাশ্বত বাণী। আকাশের ভালে লিখে দিল ধর্মের জয় গাথা।

পাণ্ডবদের জয় হল বটে। ফিরে পেলেন তাঁরা তাঁদের হৃতরাজ্য। কিন্তু ফিরে পেল না আর মনের শান্তি। জ্ঞাতি-বর্গের বেদনায় তাঁরা যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে। উত্তরার শিশু পুত্র পরীক্ষিতের হাতে অর্পণ করলেন রাজ্যভার। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে যাত্রা করলেন হিমালয়ের গৈরিক তীর্থে।

গান্ধারী

রূপে রূপসী। গুণে গুণবতী। মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে অঢেল রূপের ছটা। উছল যৌবন। চপল হাসি। চোখের তারায় দৃষ্টি হারায় অনেকের।

এমন ডাগর কন্যাকে এখন পাত্রস্থ করতে হয়।

কিন্তু পাত্র কই? চাই ছেলের মত ছেলে। উপযুক্ত বর।

গান্ধারের রাজা সুবলের, মেয়ের জন্য চিন্তার শেষ নেই। পাত্র খোঁজেন। সুপাত্র।

এমনি দিনে এলো এক দূত। দূত এলো হস্তিনাপুর থেকে। সুবল রাজ-এর কাছে।

—কি সংবাদ?

—এক প্রস্তাব আছে।

—কি?

—ভীষ্মদেব পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার মেয়ের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের প্রস্তাব করে। আপনার সম্মতি থাকলেই এ শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হতে পারে।

প্রস্তাবটি শুনে চিন্তিত হলেন রাজা সুবল। ধন, মান, কুল, শীল সবই আছে। আছে তাঁদের ভুবন জোড়া রাজত্বের খ্যাতি। এত সব থেকেও নেই ধৃতরাষ্ট্রের চোখে দৃষ্টি। সে জন্মান্ধ। তাই তো সুবল ঈষৎ চিন্তিত।

কিন্তু। দ্বিধান্বিত সুবল। যে সে লোকের প্রস্তাব নয়। প্রতিজ্ঞা-নিষ্ঠ ভীষ্মের প্রস্তাব। প্রত্যাখ্যান করলে চিরদিনের বৈরীতা। এবং তার প্রত্যক্ষ ফল বিপর্যয়। পরোক্ষ ফল অশান্তি! কাজেই সম্মত

হতে বাধ্য হলেন। গান্ধারী সব শুনলেন। তিনি প্রক্ষিপ্ত পিতৃহৃদয়কে প্রশান্ত করলেন পরিতৃপ্তির প্রক্ষেপে। তিনি বললেন—বিধির বিধান অখণ্ড অভঙ্গ। তা খণ্ডাবার ক্ষমতা কারো নেই পিতা। পতি পরম গুরু। তিনি খঞ্জই হোন, আর অন্ধই হোন, তিনিই আমার পরম দেবতা। আশীর্বাদ করুন, এই অন্ধরাজাকে বিয়ে করে আমি যেন মনে প্রাণে তাকে ভালবাসতে পারি। পারি যেন তাঁকে নিয়ে আমার নারী জীবনকে সাথক, সুন্দর ও সফল করে তুলতে।

একটি বৃহত্তর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে গান্ধারী তাঁর জীবনকে বলি প্রদান করতে কুণ্ঠিতা হলেন না। তাই তো পিতামাতা আপন কন্যার পানে তাকিয়ে ভাবলেন—ত্যাগের হোম বহ্নিতে জীবন-যৌবনের এমন অকাতর আহুতি কোন মানবীর পক্ষে সম্ভব নয়। জগতের বুকে নারী-চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাবার জন্যই তার আবির্ভাব।

যা বাস্তব, যা অপ্রিয় সত্য, তাই অখিল ধর্ম। সে ধর্মকে রক্ষা করতে হয় ধৈর্য, ক্ষান্তি, অপ্রমাদ ও ত্যাগের দ্বারা। গান্ধারীর কুমারী মনকে এ সত্যগুলো আলোড়িত করেছিল। তাই তাঁর জীবনধর্মের কুসুমকলিগুলো চারিত্রিক উপাদানে অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত হল। অন্ধ পতির কণ্ঠে মালা পরালেন তিনি। বিয়ে হয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। এই নবজীবনের মঙ্গল দ্বারে এসে স্বামীর জীবনের বঞ্চনার বেদনাকে সমান ভাগে ভাগ করে নিলেন। চোখে বাঁধলেন শত ভাঁজের বস্ত্রাঞ্চল। চর্মচোখের দেখাদেখি না হলেও মানস নেত্রে সু-সম্পন্ন হল উভয়ের শুভ দৃষ্টি। মনে প্রাণে এক হয়ে গেলেন দুজনে।

পতিগৃহে যাত্রা করলেন গান্ধারী। এলেন হস্তিনাপুরে। শ্বশুরের ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দিন বদলের পালা। শ্রী ফিরে আসতে লাগল কুরুবংশের।

কুন্তী, মাদ্রি ইত্যাদি বধূদের মধ্যে গান্ধারীই হলেন প্রধানা। তাঁর বুদ্ধি বিবেক ও বিচক্ষণতায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই শ্বশুর কুলে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতির সৌগন্ধ। ধর্মে গান্ধারীর অশেষ অনুরক্তি।

সদাচার, সত্যবাক্য ও সৎ চিন্তাই তার দিন রাত্রির কর্ম। মনে মনে তিনি ব্যাসদেবকে করতেন পরম ভক্তি। তাঁর চরণেই নিবেদন করতেন পূজার অর্ঘ্য। নিরন্তর গান্ধারীর ধ্যান, পূজন ও চিন্তনে ব্যাসদেব হলেন পরম প্রীত। বর দান করলেন তিনি। কি সে বর?

—স্বামীর মত মহাবলবান শত পুত্রের জননী হবে তুমি।

আরাধ্য দেবতার বর লাভ করে আনন্দে অধীর হলেন গান্ধারী। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি হলেন সন্তান সম্ভবা।

দিনের পর দিন হয় অতিক্রান্ত। মাসের পরে কাটে মাস। কিন্তু গান্ধারীর একি হল? দশ মাস দশ দিন তো কবেই চলে গিয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কোন লক্ষণই হচ্ছেনা পরিলক্ষিত। মনে মনে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন গান্ধারী। ঠিক এমনি দিনে শুনতে পেলেন—কুন্তীর সন্তান জন্মাবার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

সংবাদটি শুনে গান্ধারীর দেখা দিল চিত্ত বিক্ষেপ। মাথার মধ্যে টন টন করে উঠল। বক্ষপঞ্জরে হল দারুন ঝড়ের নর্তন। ধীরে ধীরে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। মনে মনে পৌঁছে গেলেন একটা স্থির সিদ্ধান্তে।

কি সে সিদ্ধান্ত?

বিক্ষিপ্ত চিত্ত গান্ধারীর। মনে মনে স্থির করলেন নিজের গর্ভপাত করবেন। করলেনও তাই। ওদিকে কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিলেন যুধিষ্ঠির। বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম কুমারই হবেন রাজ্যের অধিকারী।

গর্ভপাত করে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন গান্ধারী। বিলাপে আক্ষেপে ভরে গেল তাঁর মন। পুত্রের আশায় হিংসার বশবর্তী হয়ে অঘটন ঘটালেন বটে, কিন্তু অন্তরাল থেকে বিধি বুঝি একটু হাসলেন। গান্ধারীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হল লোহার মত শক্ত একটা মাংস পিণ্ড।

বিস্ময়ে অভিভূতা গান্ধারী। বিশ মাস গর্ভে লালন পোষণ করে

অবশেষে পেলেন একটি মাংস পিণ্ড। আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। দেব আজ্ঞায় এলো অবিশ্বাস। সন্দিহান হলেন ব্যাসদেবের বর দান সম্বন্ধে।

—আমি অভাগিনী বলেই আমার কর্মফল এই ভাবে নির্ণিত হল।

দাসীকে ডাকলেন গান্ধারী। ঘৃণায় মনটা তার বিষিয়ে উঠল। আদেশ করলেন তাকে, সদ্যোজাত মাংসপিণ্ডটি ফেলে দিয়ে আসতে।

ঠিক এমনি এক শঙ্কট লগ্নে আবির্ভূত হলেন মুনি দ্বৈপায়ন। গান্ধারী অভিমানে ফেটে পড়লেন ব্যাসদেবকে দেখে—তুমি না বর দিয়েছিলে, আমি শত পুত্রের জননী হব? কিন্তু বিশ মাস গর্ভে ধারণ করে এ আমি কি পেলাম? কি বর তুমি আমাকে দিলে, হে প্রভু!

ব্যাসদেব গান্ধারীকে তিরস্কার করতে লাগলেন—তুমি ধর্মনিষ্ঠ মহা তাপসী। একাজ তোমাকে শোভা পায় না। হিংসার বশবর্তী হয়ে এত বড় অধর্ম-কর্ম করতে এতটুক দ্বিধা এলোনা তোমার মনে? হিংসার ফল বড় ভয়াবহ। তার দহনে নিজেই দাহ হয়। হয় অধর্মের পথে পরিচালিত।

মুনির কথা শ্রবন করে লজ্জায় মাথা হেট করলেন গান্ধারী। নিজের অপরাধ সম্বন্ধে হলেন অবহিত। বড় অসহায় মনে করতে লাগলেন নিজেকে। ব্যাসদেব গান্ধারীর অনুশোচনার অন্তরে দিলেন সান্ত্বনার স্পর্শ। শোনালেন আশার বাণী—আমার বাক্য অভ্রান্ত। তার অন্যথা হবার উপায় নেই। মন থেকে দূর কর দুঃখ। আমার কথা শ্রবণ কর, ঠাণ্ডাজলে ভিজিয়ে রাখ মাংসপিণ্ড। ও থেকে উৎপত্তি হবে একশত ভ্রূণ। রাখবে আলাদা করে শত ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে। উতলা হয়ো না। কালে তোমার শত পুত্র লাভ হবে।

যথা সময়ে আবির্ভূত হয়ে যথা নির্দেশ প্রদান করে ঋষি চলে গেলেন হিমালয়ে। ব্যাসদেবের নির্দেশমত কাজ করে গান্ধারী লাভ করলেন দুর্যোধনকে। পুত্র লাভ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনোবাসনা হল না পূর্ণ। কারণ দুর্যোধনের বহুপূর্বেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম হল।

কুন্তী কনিষ্ঠা হলেও তার কাছেই পরাভব হল গান্ধারীর। যুধিষ্ঠির সুলক্ষণযুক্ত সুপুত্র। কুন্তীর তৃপ্তি আর ধরে না। কিন্তু গান্ধারীর অদৃষ্টে ঘটল বিপর্যয়। দুর্যোধন জন্মেই চীৎকার করে উঠল গর্দভ-কণ্ঠে। তার কণ্ঠে যেন কণ্ঠ মিলিয়ে চতুর্দিক থেকে ডেকে উঠল শেয়াল, শকুন ও কাক। এহেন অমঙ্গল সংকেতে শঙ্কিতা হলেন গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরও হল ভীতগ্রস্থ। তিনি ভীষ্মকে বললেন—যুধিষ্ঠিরই রাজপদের অধিকারী বটে, কিন্তু তার পরে? তারপরে কি আমার এই পুত্র রাজা হবে?

ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে আবার ডেকে উঠল শেয়াল গুলো। আকাশে উড়ে উড়ে ডাকতে লাগল শকুন আর কাক।

সম্মুখে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ। বিদুরও রয়েছেন। তারা বলতে লাগলেন তখন—মহারাজ, আপনার বংশ ধ্বংস করবে এই পুত্র। কাজেই অধিক স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বেই একে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতৃহৃদয় সব শুনেও যেন শুনলেন না কিছুই। বিদুরের উপদেশ তাঁর কাছে হল উপেক্ষণীয়।

কিন্তু গান্ধারী হয়ে পড়লেন বিচলিতা। শঙ্কার শর্বরী গ্রাস করল তাঁকে। দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ শ্রবণ করে তাঁর মায়া দয়া মাখা কুসুম স্নিগ্ধ কোমল মনটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এমন সন্তানকে পালন করতে তিনি রাজি নন। তাই মহারাজের কাছে বললেন গান্ধারী—সবাই তো একই কথা বলছেন। দিচ্ছেন একই পরামর্শ। এমন কু-পুত্র গর্ভে ধরে আমার কলঙ্ক অবধারিত। আপনার মান সম্ভ্রমও নিশ্চয় ওর দ্বারা ধূসর হবে। কাজেই আমি বলছি, সময় থাকতে সাবধান হোন। পরিত্যাগ করুন এ কুপুত্র কে।

এবারেও জয় করতে পারলেন না ধৃতরাষ্ট্রকে। গান্ধারীর সব প্রচেষ্টা হল ব্যর্থ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র স্নেহেও অন্ধ। কাজেই তাঁদের

ভবিষ্যৎ জীবনের গতি প্রকৃতিও সেই আঁধারের অন্তরালেই রয়ে গেল।

স্বামীর মুখ চেয়ে দুঃসহ মানসিক পীড়নের মধ্যেও গান্ধারী বাধ্য হলেন পুত্রদের স্নেহ-মমতায় লালন পালন করতে।

দুর্যোধনের পরে জন্ম নিল দুঃশাসন। দুঃশলা নামে গান্ধারীর একটি কন্যাও হল। শতপুত্র হল পর পর।

গান্ধারী সদা সজাগ প্রহরী। সংযমে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় তিনি শৈশব থেকেই চাইলেন তাদের মানুষ করে তুলতে। কিন্তু সব চেষ্টাই হল তাঁর ব্যর্থ। এবং ব্যর্থতার প্রধান সহায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন ধৃতরাষ্ট্র নিজে।

গান্ধারীর সুখ, শান্তি, আনন্দ চির দিনের মত হল তিরোহিত। তিনি সন্তানদের পানে তাকিয়ে হতাশায় বেদনায় মাঝে মাঝে অধীর হয়ে ওঠেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন মদোমত্ত। ক্রূরতায় ভরা তার মন। শুধু কি তাই? দাদার পথ অনুসরণ করতে লাগল অপর ভাইয়েরা। ছোট ছোট কারণে অকারণে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়ে কলহে। গান্ধারী একথা খুব ভালভাবেই জানতেন যে, পাণ্ডু-পুত্রগণ ধার্মিক। এবং সততা, সৌন্দর্য ও মহত্বই তাঁদের চরিত্রের মূলবল। কাজেই নিরপেক্ষ মন নিয়ে গান্ধারী ছেলেদের গুণ বিচারে হতেন অবতীর্ণ। মায়ের কঠোরতায় পুত্রদের চরিত্র হয়ত কিছুটা সুন্দর হতে পারত, যদি ধৃতরাষ্ট্র সহায় হোতেন গান্ধারীর। দুজনে ছেলেদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখি। ছেলেরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না। তারা মাকে চলত এড়িয়ে। যা কিছু অপরাধ পিতার কাছে গেলেই মিলত ক্ষমা।

দুর্বলচেতা মানুষ আপন দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য সদা সর্বদা ধর্মের দোহাই দিয়ে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রেরও হল তাই। পুত্র বৎসল পিতা শত পুত্রের শত দোষ দেখেও উদাসীন। কিন্তু গান্ধারী কঠোর। তিনি স্বামীকে বললেন, 'মুর্খস্যলাঠ্যৌষধি'।—কঠোর শাসন বৈ দুর্যোধনকে

কিছুতেই পথে আনা যাবে না। অন্ধরাজ তাঁর অন্ধ স্নেহের দ্বারা ওদের অশেষ অহিত সাধন করছেন।

ধীর কণ্ঠে রাজা জবাব দিলেন—আমার জন্মান্ধতার জন্য আমি রাজা হতে পারিনি। আমার অপরাধেই আমার পুত্রেরা রাজ্য পাবে না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে ওরা অভিমানে হয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ। পাণ্ডুগণের সঙ্গে লিপ্ত হয় বিরোধে। ও কিছু না। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বোধে ওরাও পরিত্যাগ করবে অসৎ পথ।'

অন্ধ স্নেহাসক্ত মন দুর্দিনের শিখরে দাঁড়িয়েও সুদিনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ছেলেদের বয়োপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষমান। কিন্তু কি প্রাপ্তি হল? ধর্মপ্রাণ পাণ্ডু-পুত্রগণ বড় হতে লাগলেন, আর ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁদের যশোসৌরভ। অসহ্য হল তা ক্রুর খল দুর্যোধনের। পরামর্শে বসলেন মাতুল শকুনিক সঙ্গে। লিপ্ত হলেন পাণ্ডুপুত্রগণকে হত্যার চেষ্টায়। পাঠালেন তাঁদের বারণাবতের জতু-গৃহে। করলেন তাতে অগ্নি সংযোগ। ঘর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ধর্মের ধ্বজা রইল উড্ডিন আকাশে। দুর্যোধন ভাবলেন শত্রু নিধন সমাপ্ত। পাণ্ডুপুত্রগণ অগ্নি দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আনন্দ আর ধরে না দুর্যোধনের। তিনি চতুর্দিকে বিজয় উৎসবের আয়োজন করলেন।

এ দুঃসহ সংবাদ পৌঁছল গিয়ে গান্ধারীর কানে। তিনি শোকে, দুঃখে পড়লেন অধীর হয়ে। অভিশাপ দিলেন ছেলেদের। কামনা করলেন মৃত্যু। এমন নীচ, হীন, কপট কুটিলদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই। ছুটে গেলেন গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বললেন ওঁদের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করতে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কোন দণ্ডাজ্ঞাই দিতে পারলেন না। তাঁর বেদনার্ত মন মাত্র তিরস্কার করেই হল ক্ষান্ত।

এত বড় একটি শোকাবহ নাটকের অন্তরালে জ্বলে উঠল জীবনের দীপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিগন্তে উদ্‌ভাসিত হল নবারুণ।

দুর্যোধনের ক্রূরতা ও মূঢ়তার মৃত্যুজালের বাইরে দাঁড়িয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ ঘোষণা করলেন দ্রৌপদীকে বিয়ে করবার সংবাদ।

মহামতি বিদুরের দিব্য দর্শন রক্ষা করল পাণ্ডুপুত্রগণের জীবন। তিনি বহু পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছিলেন জতুগৃহ থেকে পালিয়ে গিয়ে ছদ্ম-বেশ ধারণ করে অজ্ঞাতবাসে থাকতে।

গান্ধারী শুনলেন পঞ্চপাণ্ডব পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে লাভ করেছে স্বয়ংবর সভায়। আনন্দে তাঁর অন্তর ভরে গেল। মহাসমারোহে তাঁদের নিয়ে এলেন হস্তিনাপুরে। নব বধূকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুবুক্ষিত স্নেহ-ভাণ্ডার উজার করে আশীর্বাদ করলেন,— চিরজয়ী হয়ে সুখে রাজ্য ভোগ করবে তোমার স্বামীরা।'

দ্রৌপদী হবে তাঁদেরই অনুগামিনী।

দুর্যোধনের অন্তরে অসহ্য যন্ত্রণা। অপমানে অসম্মানে জর্জরিত হয়ে উঠলেন তিনি। মাতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত। পিতৃহৃদয় অসুখী। চক্রান্ত-জাল ছিন্ন ভিন্ন। এ সব কথা যখন দুর্যোধন ভাবেন' এখন তিনি হন অস্থির হয়ে। তাঁর ইচ্ছা করে পঞ্চপাণ্ডবকে জীবন্ত সমাধি দিতে।

এদিকে নতুন বধূ নিয়ে পরম প্রীত গান্ধারী। বেশ সুখে শান্তিতে কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু দুর্যোধনের অশোভন আচরণ তাঁদের মনে ভীতির সঞ্চার করল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনায় দুর্যোধনকে রেখে ওদের পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। ধৃতরাষ্ট্র ওদের মধ্যে সমবণ্টনে বণ্টিত করে দিলেন রাজ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থের প্রজাবর্গ যুধিষ্ঠিরের মত রাজা পেয়ে পরম খুশী হল। ধনে, মানে, সম্ভ্রমে ও গৌরবে ইন্দ্রপ্রস্থের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই পরিচালিত হতে লাগল রাজ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থে এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন যুধিষ্ঠির। রাজসূয় যজ্ঞ। সমস্ত রাজা এ যজ্ঞস্থলে ঘোষণা করলেন যুধিষ্ঠিরকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলে।

এ ঘোষণা দুর্যোধনের কর্ণে যেন বিষ ঢেলে দিল। তিনি আবার শরণাপন্ন হলেন শকুনির। পাশা খেলায় আহ্বান করলেন হস্তিনায়

যুধিষ্ঠিরকে। পাশা খেলা হল কাল। একে একে সর্বহারা হলেন যুধিষ্ঠির। এমনকি পঞ্চভাই, দ্রৌপদী ও রাজত্ব সব কিছু পাশা খেলায় পণের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হল।

পরাজিত সম্রাট। হৃতমানে দিন যাপন করতে লাগলেন অসহ্য লাঞ্ছনার মধ্যে। দুর্বিনীতের দল উশৃঙ্খলতার সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় নিয়ে এলেন কেশাকর্ষণ করে। চাইলেন তার নগ্ন সৌন্দর্যকে লুণ্ঠন করে রাজসভার আনন্দ বর্ধন করতে।

অন্তঃপুরে এ সংবাদ পৌঁছলে গান্ধারী উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এলেন রাজসভায়। মর্মজ্বালায় অস্থির গান্ধারী বায়ুবেগে নিবেদন করলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, 'এমন কুলাঙ্গার পুত্রকে বহু পূর্বেই ত্যাগ করা উচিৎ ছিল। স্নেহের বশে পুত্রের মুখ চেয়ে দিনের পর দিন ক্ষমা করে এসেছেন। আর কত? অত্যাচারের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। পাপিষ্ঠের অত্যাচারে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা, কুরুবংশের মর্যাদার ধ্বজা অবনমিত, পিতৃপুরুষগণ কতনা লাঞ্ছনা ভোগ করছেন—আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, দুর্যোধনকে আপনি আর ক্ষমা করবেন না।'

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বাক্যবাণে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বোঝাতে চেষ্টা করলেন। পিতৃস্নেহের দোহাই দিয়ে চাইলেন তাঁকে প্রশান্ত করতে। অন্তরে অন্ধ বাইরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। পুত্রকে দণ্ডাজ্ঞা দিতে তাঁর বক্ষপঞ্জর ভেঙ্গে যেতে চায়। তিনি তাঁর অপত্য স্নেহের কাছে অসহায়।

কিন্তু গর্ভধারিনী গান্ধারী শেখেননি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে। অধর্মের সঙ্গে আপোষ নীতি ভীরুতার নামান্তর বলেই তিনি জানেন। পাপাচারী, নারী নির্যাতনকারী, অধার্মিক, সে যত আপনজনই হোক, যত স্নেহাস্পদই হোক, এ পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই নেই। তাই গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কথার জবাবে বললেন, 'আমিও গর্ভধারিনী মাতা। সন্তানের প্রতি স্নেহ আমারও আছে। পুত্রের কল্যাণ হেতু তাকে বর্জন করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।'

সার্বজনীন মাতৃত্বের বিকশিত রূপ হল গান্ধারীর উদার চরিত্র। তিনি রাজপদতলে নিবেদন করলেন ন্যায় এবং ধর্মের জন্য নয়নের তপ্ত অশ্রু। প্রার্থনা করলেন নিরপেক্ষ বিচার। নিজের পুত্র বলে ক্ষমার্হ, আর অপরের পুত্র বলেই দণ্ডনীয়, এ কথা বিশ্বমাতৃত্বের উদার অন্তর কিছুতেই ঠাঁই করে নিতে পারল না।

ধৃতরাষ্ট্র নির্বাক। স্থাণুর মত স্তব্ধ। ন্যায় বিমুখ স্বামীর পানে তাকিয়ে গান্ধারীর বেদনার্ত হৃদয় হাহাকারে বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইল। এতদিন তাঁর গর্ব ছিল, গৌরব ছিল—তিনি ধর্মপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী এবং শত পুত্রের জননী ভেবে। আজ তা সবই যেন মিলে গেল ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে কেঁদে অন্তরকে অশেষ ক্লেশ দিতে লাগল। এবারে তিনি স্মরণ নিলেন বিধাতার। এবং তাঁর কাছেই নিবেদন করলেন অন্তরের অজস্র নালিশ। অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন।—তোমার বজ্র আসুক নেমে।

গান্ধারী মৌন। তাঁর সব আশার দীপগুলো একটা একটা করে নিভে গিয়েছে। কিন্তু দুর্যোধনের উৎসাহের অন্ত নেই। পিতার স্নেহের সুযোগে আবার পাণ্ডবদের পাশাখেলায় আহ্বান করলেন। এবারেও খেলায় হলেন যুধিষ্ঠির পরাজিত। এবং দ্রৌপদীসহ পাঁচ ভাই বারো বছরের জন্য করলেন বনগমন।

দেখতে দেখতে বারো বছর হল অতিক্রান্ত। এক বছরের অজ্ঞাত-বাসের মেয়াদও ফুরালো। পাণ্ডবগণ ফিরে চাইলেন তাঁদের হৃত রাজ্য কিন্তু দুর্যোধন কিছুতেই হলেন না সম্মত। শ্রীকৃষ্ণ এলেন দূত রূপে মাত্র পাঁচখানা গ্রাম চাইলেন পাণ্ডবদের জন্য। স্বদম্ভে দুর্যোধন বললেন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

কৃত কর্মের দ্বারাই মানুষ তার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেয়। দুর্যোধনের সামনে বহুবার বহু সুযোগ এসেছে। কিন্তু কোন সুযোগই তিনি গ্রহণ করতে রাজি নন। নিশ্চিত ধ্বংসের নেশায়

মত্ত মাতাল এগিয়ে যেতে লাগলেন প্রজ্জ্বলন্ত পাবকের দিকে। অনেক বুঝালেন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে। অবশেষে অন্ধ পিতাও বললেন, 'তোমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য ধর্মের জয় হবে।

কারোর হিতবাক্যই দুর্যোধনের পৈশাচিক মনকে বিরত করতে পারল না। যুদ্ধ হয়ে উঠল অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে মাতা গান্ধারীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেলেন দুর্যোধন। দাঁড়ালেন গিয়ে নতশিরে মায়ের কাছে। তিনিও যেন দেখেও দেখছেন না। দুর্যোধন বললেন, 'মাতঃ! যুদ্ধে যাচ্ছি। আশীর্বাদ কর, যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।

এবারেও গান্ধারী 'জয় হোক' বলে আশীর্বাদ করতে পারলেন না পুত্রকে। শুধু বললেন, 'ধর্ম যেদিকে, সে দিকই যেন জয়ী হয়।'

বিষণ্ণ মনে যুদ্ধ যাত্রা করলেন দুর্যোধন।

যুদ্ধ শুরু হল। ঘোর যুদ্ধ। প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম। সকলেই নিহত হলেন যুদ্ধে। কেবল বেঁচে রইলেন পঞ্চপাণ্ডব।

ধর্মের জয় হল। গান্ধারীর শেষ প্রার্থনা বাস্তবে রূপ নিল। শত পুত্রের জননী হয়েও আজ তিনি সন্তানহীনা। শোকাতুরা। ন্যায়নীতিতে গরীয়সী গান্ধারী সহসা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মাতৃহৃদয়ের সহজাত স্নেহের তুফান তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে গেল। শোকের অশ্রু তাঁর নয়নযুগলকে দিল প্লাবিত করে।

যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়ী হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনেও শান্তি ছিলনা কারণ এ যুদ্ধ ছিল তাঁদের অনভিপ্রেত। স্বজন বিয়োগের বেদনায় ভগ্নহৃদয় পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। গ্রহণ করলেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পদধূলি। তাঁদের সেবায় করলেন আত্মনিয়োগ। পাণ্ডবদের সেবায় তাঁরা একরকম পুত্র শোক ভুলে গেলেন।

কিছু দিন পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী তপোবনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় হলেন আত্মমগ্ন। তপস্যালব্ধ শান্তি লাভের পরে দেহত্যাগ করলেন

ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারীও দেহত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে গমন করলেন।

বহু প্রত্যাশিত এই অপার্থিব সুখ নিকেতনই ছিল গান্ধারীর প্রার্থিত তীর্থ। মানবী হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন দেবী। কল্যানী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে ছিলেন মর্তে। ধর্ম ও সত্যকে পরম যত্নে হৃদয়ে ধারণ করে অতি প্রিয় বস্তুকেও অকাতরে আহুতি দিতে কুণ্ঠা তাঁর আসেনি।

মহাভারতের পৃষ্ঠায় ব্যাসদেব নারী ধর্মের চরম ও পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গান্ধারীর উদার চরিত্র চিত্রনে।

॥ বেহুলা ॥

আজও ভেসে আসে—

ভেসে আসে মেঘনা, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁর ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাঁয়ের বধূদের কাঁদোন ধোয়া কণ্ঠ—

আজু বিয়া হইল রাতি
না চিনিলা নিজ পতি
বিয়ার রাত্রে সাপে খেল মোরে।'

লোহার বাসর ঘরে শুয়ে আছেন লক্ষ্মীন্দর। বক্ষ লগ্না নব পরিণীতা বধূ বেহুলা। ঘুমন্ত বধূ। চোখে তাঁর নিদ্রার অন্ধকার! মুখে মাখা কুসুমের স্নিগ্ধতা। যৌবন-মুখর অঙ্গে অঙ্গে নেশার মৌতাত। দুটি কপোত কপোতি যেন। পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল।

সহসা সজাগ হয়ে গেল লক্ষ্মীন্দর। বিধাতার নির্মম নির্দেশে দংশন করল তাঁকে কাল সর্প। বিলাপে, বিক্ষেপে, বেদনায়, আর্তিতে ভেঙ্গে পড়ল লখাই। ডাকতে লাগল পাশেই শুয়ে থাকা বেহুলা সুন্দরীকে, বলতে লাগল বেদন করুন কণ্ঠে—ওগো, আঁখি মেল। জন্মের মত দেখে নাও তোমার পতিকে। পরিচয় হবার আগেই বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। বিয়ের শুভ রাত্রি পরিণত হল কালরাত্রিতে। কাল সর্প আমাকে দংশন করেছে।

কিন্তু কে এই লক্ষ্মীন্দর? কে এ

সে অনেক, অনেক কালের অতীত কাহিনী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক। সাগর-বেলায় উজানী নগরে ছিল সাহে বণিকের ঘর। তারই মেয়ের নাম ছিল বেহুলা। কালো মিশমিশে ঝাঁকড়ানো ছিল তার মাথার কেশ। কাঁচা মুখ। মিষ্টি মধুর হাসি। সদা চুম্বনরতার

আরক্তিমতা অধরে। বেহুলা রূপে রূপসী। গুণে গুণবতী। নৃত্যে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এইজন্য তার আর একটি নাম ছিল বেহুলা নাচুনী। দর্শন লোভন কন্যার রূপের ছ্টা অরুনোদয়ের সূর্যকে দিত লজ্জা। মনে হত যেন স্বর্গের কোনো অপ্সরা মানবীর বেশে নেমে এসেছে মর্তে।

উজানী নগরের সাধু সওদাগরের কন্যা বেহুলা সাগর বেলায় পরম বিস্ময়। এ যেন অরণ্যানীর অন্তরালে এক ফালি স্নিগ্ধ চাঁদের হাসি। এ যেন পাহাড়ের বুক চেড়া চঞ্চলা নদীটি কালের প্রবাহে বয়ে চলেছে অবিরাম কল কল ছল ছল ছন্দে। কবে যে তার জীবনের কুঁড়ি পাপড়ি মেলল আকাশে তা সে নিজেই জানে না। কিশোরী বেহুলার দেহে নামে যৌবনের ঢল। মুগ্ধ ব্যাকুলা বেহুলা। বিস্ময় ভরা আঁখি। অন্তরের প্রসুপ্ত বাসনাগুলো কখন যেন পদ্মকোরকের মত ফুটে উঠল তার বক্ষের দুধারে। তারা মানেনা বসনের শাসন। কার যেন কর পরশের প্রত্যাশা তাকে অধীর আকুল করে তোলে। কেশবতী কন্যার দেহের দুয়ারে অজস্র উচ্ছাস। বসন্তের কুসুমে তার যৌবন-বন আরক্তিম। বেহুলা বিবাহ যোগ্যা।

গাঙুর নদীতীরে চাঁপাই নামে ছিল এক গণ্ডগ্রাম। সেখানে বাস করতেন এক বণিক। নাম ছিল তাঁর চন্দ্রোধর, চাঁদো বা চাঁদ। নিষ্ঠাবান শিব ভক্ত চাঁদ। যাগ যজ্ঞ দ্বারা লাভ করেন শিব-প্রীতি। অধিকারী হন মহাজ্ঞান মন্ত্র ও সিদ্ধি জটার (অথবা সিদ্ধিঝুলি)। লাভ করেন অজর অমরত্ব।

সুখের সংসার। পত্নী সনকা ছয় পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে পরম তৃপ্তিতে দিন যাপন করছেন। ধনে মানে যশে গৌরবে চাঁদের খ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত। চাঁদ সওদাগর। বাণিজ্যতরী নিয়ে পাড়ি দেন সমুদ্র। ফিরে আসেন অজস্র ধনকড়ি নিয়ে।

একদিন সনকা নদী থেকে স্নান করে ফিরছিলেন ঘরে। আসতে আসতে দেখলেন জেলে পাড়ায় জালু মালুর ঘরে মহাসমারোহে

কিসের যেন পূজা হচ্ছে। খোঁজ নিলেন সনকা। জানলেন জালু-মালু দুই ভাই মনসার ঘট পেয়েছে নদীতে। তারই পূজা অর্চায় ওরা দুটি ভাই তন্ময়। করবেনা কেন। মনসার পূজা করে জেলে জালু-মালু মায়ের কৃপায় হয়েছে প্রভূত অর্থের অধিকারী।

সনকার মন ভিজল। তিনি গেলেন জালু-মালুর মায়ের কাছে। শিখে নিলেন মনসার পূজা পদ্ধতি। গোপনে করতে লাগলেন দেবীপূজা।

কিন্তু গোপন আর বেশী দিন গোপন রইল না। একদিন সনকার পূজার ঘট দৃষ্টি গোচর হল চাঁদ সওদাগরের। মনে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন—অন্য দেবতার পূজা করছে তার স্ত্রী।

আর পারলেন না ধৈর্য্যের বাঁধ রাখতে। রাগে ফেটে পড়লেন সওদাগর চাঁদ। লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেললেন মনসার ঘট। চাঁদের সৌভাগ্যের দুয়ায় রুদ্ধ হয়ে গেল অতর্কিতে। খুলে গেল দুর্ভাগ্যের অর্গল-দ্বার। মনসা হলেন রুষ্টা। চাঁদের অনিষ্ট সাধনে সদা ব্যস্ত তিনি। কিন্তু চাঁদ যোগ-সিদ্ধ। সিদ্ধিজটা তাঁর করায়ত্ব। কিছুতেই তাঁকে পরাভূত করা যাচ্ছে না দেখে মনসা ধারণ করলেন মোহিনী মূর্তি। অপহরণ করে নিলেন চাঁদের মহাজ্ঞান ও সিদ্ধিজটা। শুরু হল চাঁদ সওদাগরের সর্বনাশের পালা। ছখানা বাণিজ্য তরী হল জল মগ্ন। পরপর ছয়টি পুত্র হারাল জীবন। আদিগন্ত বিস্তৃত বৃক্ষোদ্যান পরিনত হল মরুভূমিতে। এত সব বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও চাঁদ অটল-অনড়। তিনি কিছুতেই মনসার কাছে করবেন না মাথা নত। ঐশ্বর্যের কনক মিনার থেকে সওদাগর নেমে এলেন দীনতার পর্ণ কুটিরে। সনকা শোকে দুঃখে স্বামীর কাছে করলেন অশ্রু বিসর্জন। পাড়ার লোকেরা চাঁদকে দিতে লাগল নানা উপদেশ। কিন্তু চাঁদ কঠিন কঠোর বজ্র দৃঢ়। তাঁর বেদনার্ত হৃদয় শোকে, দুঃখে, লাঞ্ছনায় আজ পাষাণের মত স্তব্ধ। মনসার কাছে ঘাট তিনি কিছুতেই মানবেন না।

কিছু দিন এমনি একটা অস্বস্তির মধ্য দিয়ে কাটল। অবশেষে এল একটি পুত্র সন্তান সনকার কোলে। ছয় পুত্র হারিয়ে সনকা পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। এ পুত্র যেন সেই দুঃখের সমুদ্র শিয়রে একটি গভীর প্রশান্তি। ছেলের নাম লক্ষ্মীন্দর। মায়ের বুক সদা করে দুরু দুরু। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অনেক করে বুঝালেন স্বামীকে। তবুও চাঁদ সওদাগর কিছুতে স্বীকৃত হলেন না মনসাকে পূজো করতে।

শৈশব, কৈশোর অতিক্রান্ত হল লক্ষ্মীন্দরের। পদার্পণ করলেন তিনি যৌবনের উপকূলে। বয়স হয়েছে লখাইর। দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগল ঘটক। অবশেষে এসে উপস্থিত হল সাহে সওদাগরের বাড়ীতে। দেখল বেহুলাকে। পরমা সুন্দরী কন্যা। সুলক্ষণা। ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। সেই উজানী নগরের সাধু সওদাগরের কন্যা বেহুলার বিয়ে হবে চাঁদ-সওদাগরের ছেলে লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে। দুজনার রূপই অপূর্ব। এ যেন রাজ যোটক! কিন্তু দৈবজ্ঞ দিয়ে গেলেন চাঁদকে একটি দুঃসংবাদ। তিনি বললেন, 'বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে লক্ষ্মীন্দরের।'

পূর্বাহ্ণে বিপদ সঙ্কেত পেয়ে সাবধান হলেন চাঁদ সওদাগর। সাঁতালি পর্বতে নির্মাণ করালেন লোহার বাসর ঘর। সর্প যাতে এখানে না আসতে পারে, তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করলেন অবলম্বন। কিন্তু দেবতার সঙ্গে মানুষ কতক্ষণ পারে লড়াই করতে? মনসাদেবীর নির্দেশে বাসর নির্মাতা ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র রেখে দিল লোহার বাসরে। চাঁদ সওদাগর তা জানতেও পারলেন না।

লখাই বেহুলার বিয়ে হয়ে গেল মহাসমারোহে। সাঁতাল পর্বতে লোহার ঘরে হল বাসর শয্যা। শুয়ে দুজনে। মনের মত স্ত্রী। নয়ন লোভন রূপ। বেহুলার অঙ্গে অঙ্গে চুম্বকের আকর্ষণ। লখাই আদরে সোহাগ ভরে তুলল বেহুলাকে। আশীষ চুম্বন করল ললাটে। আসঙ্গাতুর বেহুলা দুটি কনক বাহু প্রসারিত করে দিল। দুটি মঙ্গল

কুঞ্জে জানাল পুরুষ চেতনাকে অভ্যর্থনা। লখাই মুগ্ধ। একই বৃন্তে যেন দুটি ফুল মেলে দিল সৌরভের পাপড়ি।

অনেকটা সময় হল অতিক্রান্ত। একসময়ে তন্দ্রা নেমে এল লখাইয়ের নয়নে। ঘুমিয়ে পড়ল। পরম যত্নভরে বেহুলা করতে লাগল স্বামীর পদ সংবাহন।

সহসা জেগে উঠল লক্ষ্মীন্দর। ভাত খেতে চাইল বেহুলার কাছে। ওখানেই রান্নার আয়োজন করল বেহুলা। পরম তৃপ্তি ভরে আহার করল লখাই। শুয়ে পড়ল দুজনে। ঘুমিয়ে পড়ল একসময়ে।

নিদ্রিতা বেহুলার বুকের মধ্যে ঘুমন্ত লখাই। সহসা চীৎকার করে উঠল—ওগো, ওঠো! সর্বনাশ হয়েছে! কাল নাগিনী দংশন করেছে আমাকে।

সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করেছিল সর্প। প্রবেশ করেছিল লখাইয়ের লোহার বাসরে। চাঁদ সওদাগরের প্রতি মনসার কোপের শেষ আঘাতে লক্ষ্মীন্দরের জীবন দীপ হল নির্বাপিত। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বেহুলা। সবাই চলে এল বাসর ঘরের দ্বারে। প্রত্যুষের আলো পড়েছে পূবের দিগন্তে। পাখীদের কণ্ঠে দিবসের সঙ্গীত। কিন্তু বেহুলার ক্রন্দন কণ্ঠ সকলকে দিল ম্লান করে। সওদাগর চাঁদ এসে একবার দাঁড়ালেন দরজার কাছে। শেষ বারের মত দেখে নিলেন মৃত পুত্রের মুখ। শোকে দুঃখে চাঁদ হাহাকার করে উঠলেন। দুটি চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা।

বেহুলার কোলে মৃত লক্ষ্মীন্দর শায়িত। সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। ভাসিয়ে দিতে হবে তাকে ভেলায় করে নদীর স্রোতে। এই তো প্রথা ছিল সেকালের। তাই আয়োজন করতে লাগল সবাই। তৈরী হল ভেলা। এগিয়ে এল লখাইকে ভেলায় তুলতে। কিন্তু বাধ সাধল বেহুলা। সে তার স্বামীকে একা ভেসে যেতে দেবে না। সেও বসল গিয়ে ভেলার উপরে। এ যেন সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি। স্বামীর শবটি তুলে নিল কোলে। কত সহস্র লোক এ দৃশ্য দর্শন

করে কান্নায় পড়ল ভেঙ্গে। বেদনার অশ্রুনদীতে যেন বান ডাকল। খবর পেয়ে বেহুলার ভায়েরা এল ছুটে। চাইল, বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু বেহুলা অটল। কারো উপদেশ, নির্দেশই তার ধ্যান ভাঙতে পারল না। সে শব নিয়ে ভেলা ভাসাল গাঙ্গুরের স্রোতে।

গাঁয়ের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেলা চলল এগিয়ে। এগিয়ে চলল নদীর বাঁকে বাঁকে। কত লোক এল এগিয়ে। দেখাল প্রলোভন। কেউ বা চেষ্টা করল বলপ্রয়োগ করে যৌবনা যুবতীর দেহ লুণ্ঠন করতে। কখনোবা বাঘের তাড়া খেল। অস্থির হয়ে উঠল শেয়াল, কুমীরের তাণ্ডবে। কিন্তু বেহুলা অটল। ভয়কে সে জয় করেছে. তাই স্বামীর দেহটি কিছুতেই নামাল না কোল থেকে।

ক্রমে মৃতদেহে শুরু হল পচন। গলিত মাংস। টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে লাগল খসে। দুর্গন্ধে কে তার কাছে বসবে? বেহুলার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় বলতে আজ আর কিছু নেই তার। দৃষ্টি তার সম্মুখের দিকে। ভেলা শুধু ভাসছে আর চলছে। চলতে চলতে এসে উপনীত হল ত্রিবেনীর ঘাটে।

গাঙ্গুর আর গঙ্গার সঙ্গম স্থল।

অদূরে চৌমুহানী, সে কালের গঙ্গা-সাগর তীর্থ।

এখন কোন দিকে যাবে বেহুলা? কিছুই ঠিক করতে পারছে না। হতচকিতের মত গাঙ্গুর-গঙ্গার মোহনায় লগিতে ভেলা বেঁধে বসে রইল বেহুলা। তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে নদীর পানে।

ঠিক এমনি একটা শঙ্কট লগ্নে তার দৃষ্টির দিগন্তে প্রভাস্বর হয়ে উঠল এক অলৌকিক ঘটনা—এক ধোবানী ছোট্ট ছেলে কোলে করে আসছে কাপড় কাচতে। ছেলেটি বড্ড দুষ্ট। বারে বারে বাধার সৃষ্টি করছে ধোবানীর কাজের। বিরক্ত হ'ল ধোবানী। ছেলেটির পা দুটো ধরে পৈঠায় মারল এক আছাড়। মরে গেল ছেলেটি, ফেলে রাখল এক ধারে। শুরু করল আবার কাপড় কাচতে।

বেহুলা এ দৃশ্য দেখে তো অবাক! এ আবার কেমন ধারা রীতি! ছেলে মেরে কাপড় কাচা!

কিন্তু তারপর?

কাপড় কাচা হয়ে গেল। শুকোতে দিল তা রোদ্দুরে। একটু বিশ্রাম করে নিল ধোবানী। তার পরে শুকনো কাপড়গুলো ভাঁজ করল পাটে পাটে। ছিটিয়ে দিল মৃত ছেলেটির দেহে কয়েক ফোঁটা জল। জীবন্ত হয়ে উঠে বসল ছেলেটি। কোলে নিল তাকে ধোবানী। কাপড়ের মোট নিল মাথায়। চলে গেল তার গন্তব্য পথে।

ভেলায় বসে বসে সব দেখল বেহুলা। তার মনের ক্লান্তি-বৃন্তে অজস্র প্রশ্নের শরবর্ষণ শুরু হল—এ কি করে সম্ভব! নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে দেবীশক্তি! ধোবানীকে জিজ্ঞেস করতে হবে!

সারাটা রাত হল অতিক্রান্ত। ভোর হল। যথা সময়ে ধোবানী এল কাপড়ের মোট নিয়ে ঘাটে। বেহুলা এগিয়ে গেল তার কাছে। জিজ্ঞেস করল পরিচয়—কে গা তুমি?

—মনসার সখী গা। নাম নেতা।

বেহুলা এবারে নেতার পা দুটি ধরে কেঁদে ফেলল। এবং বলতে লাগল তার বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী।

নেতা নীরবে সব শুনল। অবশেষে বলল—তোমার লখাইকে বাঁচান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মনসা দেবী তা পারেন।

অশ্রু সজলা বেহুলা অপলক তাকিয়ে রইল নেতার মুখের পানে। চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠা—তা কি করে সম্ভব?

নেতা বলল—মনসা দেবী যাতে তোমার উপর প্রীত হন, সে চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করব।

—করবে তুমি তা?

—কথা দিলেম, নিশ্চয়ই করব। তোমাকে দেখে আমার বড্ড মায়া লাগছে। তুমি তাকে প্রাণভরে ডাক। আমিও বলব।

সেদিন নেতার সব কাপড়গুলো কেচে দিল বেহুলা। নেতার

চেয়েও ধবধবে হল কাপড়গুলো। দেবতারা কাপড় দেখে বললেন—এমন ধবধবে করে কোন দিন তো কাচনি তুমি, ব্যাপারটা কি হে?

নেতা বলল—আমি নয়. আমার বোনঝি এবারে কেচেছে।

খুশী হলেন দেবতারা। বললেন—নেতা তোমার বোনঝিকে একদিন নিয়ে আসবে এখানে!

দুর্ভাগ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে এল আলোর আপ্লব। তিমির তন্দ্রা টুটে গিয়ে দেখা দিল প্রত্যুষের প্রসন্নতা। নেতার পিছু পিছু বেহুলা গিয়ে দাঁড়াল দেবসভায়। লীলায়িত দেহে তার জেগে উঠল নৃত্যছন্দ। মুখে কিছু ব্যক্ত করল না সে। নিবেদন করল না এক বিন্দু আঁখি বারি। তার প্রিয়ের তনুটি অন্তরে স্থাপিত করল সে একান্ত গোপনে। নতুন শক্তি সঞ্চারিত হল কৃশ তনুতে। আট-সাট করে বেঁধে নিল অঙ্গের বসন। স্খলিত কবরী ক'রল বেনীবন্ধ। পীনোদ্ধত স্তনদ্বয় থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল চন্দ্রের স্নিগ্ধদ্যুতি। লীলা চঞ্চলা বেহুলার নৃত্য-ছন্দে জেগে উঠল জীবনের বাণী।

প্রীত হলেন দেবতারা। পরম খুশি হলেন নটরাজ। আদেশ করলেন মনসাকে লক্ষ্মীন্দর ও আর সকলের জীবন ফিরিয়ে দিতে।

বেহুলা প্রতিজ্ঞা করল মনসার কাছে যে, সে এবার থেকে তার শ্বশুরকে দিয়ে করাবে তাঁর পূজা।

খুশি হল দেবতারা। খুশি হলেন মহেশ্বর! খুশি হলেন মা মনসা।

জীবন ফিরে পেল লক্ষ্মীন্দর। বেঁচে উঠল চাঁদসওদাগরের মৃত পুত্রেরা ও মাঝি মাল্লারা। ভেসে উঠল ধনদৌলত বোঝাই সপ্ত ডিঙ্গা। পরম আনন্দে লখাই-বেহুলা নৌকায় করে এগিয়ে চলল ঘরের পানে। পথে পড়ল উজানী নগর। দুজনে ধারণ করল যোগিবেশ। দেখা করে এল মায়ের সঙ্গে। তার পরে এসে পৌঁছাল চম্পক নগরে। আনন্দের বান ডাকল। হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের ফিরে পেলেন চাঁদসওদাগর। সনকা বিস্ময়েও আনন্দে পড়লেন অভিভূতা হয়ে।

চাঁদ স্তব্ধ, শান্ত। দৃষ্টি তাঁর অপলক। তিনি দেখছেন—তাঁর সপ্ত ডিঙ্গা। তার মাঝিমাল্লা। ধন জন সব কিছু।

আজ আর তিনি দৃঢ়তার কাঠিন্যে পারলেন না নিজেকে আবদ্ধ রাখতে। ভক্তি, প্রেম, ভালবাসায় চিত্ত তাঁর উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে প্রণাম জানালেন মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে। করলেন পূজার আয়োজন। দেবীর চরণে অবশেষে ঘাট মানলেন শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর। চাঁদের পূজায় পরম প্রীত হলেন মা মনসা। করলেন তাঁর প্রধান পূজারীকে আশীর্বাদ। সংসারের মায়া তার অন্তরে করল ছায়া সঞ্চার। ছয় পুত্রকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধলেন তিনি।

লখাই আর বেহুলা মনসার সঙ্গে চলে গেলেন স্বর্গে। ওরা মর্তের নয়—ইন্দ্রসভায় শাপ-ভ্রষ্ট দুটি নট আর নটি।

ওদের মৃত্যুহীন অক্ষয় জীবন চির জাগ্রত হয়ে রইল এয়োর শঙ্খে আর সিঁথির সিঁদুরে। মহিমময়ী পূণ্য সতী বেহুলার প্রেমের মূরতি মর্তের ঘরে ঘরে জ্বেলে দিল সত্যের দীপাবলী।

"যুগ যুগান্তে তাই,—
জাগিয়া লখাই—জাগিয়া বেহুলা,—
মৃত্যু তাদের নাই।"

আজো এ কাহিনীর কান্না পূর্ববঙ্গের প্রতিটি মানুষের অন্তরকে মন্থন করে ভেসে যায়—

ভেসে যায় পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁর ঢেউ ভেঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

ভেসে যায় মর্তের এ মরমী কণ্ঠ সীমা থেকে অসীমে—'স্বর্গের দেবলোকে, মহেশ্বরের পদতীর্থে